বাংগালী লৌকিক ঐতিহ্যে মুক্তবুদ্ধির চর্চা

আলমগীর হোসেন
২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪
(যুক্তিবাদী দিবস উপলক্ষ্যে লিখিত)

উৎসর্গঃ হুমায়ুন আজাদ - বাংলাদেশের প্রধানতম প্রথাবিরোধী লেখক, মুক্ত মনাদের প্রেরণার উৎস

যুক্তিবাদ ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার ধ্যান-ধারনা নেহায়েতই পাশ্চাত্যের দেশগুলো থেকে আমদানীকৃত বলে আমাদের বাংগালী ও ভারতবর্ষীয়দের মানসপটে দৃঢ়মূল। অর্থাৎ পাশ্চ্যাত্যের সপ্তদশ- অষ্টাদশ শতাব্দীর *'রেনেসাঁস'* (Renaisance) এবং *'এনলাইটনমেন্ট'* (*Enlightenment*)-এর মত ঘটনা থেকেই মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রসার ঘটেছে ভারতীয় উপমহাদেশে ও সারা পৃথিবীতে বলে মনে করা হয়। কিন্তু এমন ধারণাটি মোটেও সঠিক নয়। আমাদের বাংগালী ঐতিহ্যেই প্রকৃত ধরনের মুক্তবুদ্ধির যে চর্চা হয়েছে যুগে যুগে, সেটা আমাদের অনেককেই বিস্মিত করতে বাধ্য। এই রচনাটিতে আমাদের বাংগালী ঐতিহ্যে মুক্তবুদ্ধি চর্চার রূপরেখাকে চিত্রায়িত করার প্রয়াস করা হয়েছে স্বল্প পরিসরে।

বুদ্ধিমান জীব হিসেবে পৃথিবীতে আবির্ভাবের শুরু থেকেই মানুষ বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির প্রয়োগ করে এসেছে যা তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে এবং মানুষ আজ জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে তার আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েছে। তথাপি এটা সহজেই অনুমেয় যে প্রতিকুল প্রাকৃতিক ও সামাজিক শক্তির মোকাবেলা করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ বিহ্বল হয়ে পড়েছে এবং তার বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি পরাজিত হয়ে বন্দী হয়ে পড়েছে নানারকম বদ্ধমূল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারণার পরিমন্ডলে। এবং বর্তমান যুগেও যে বিশ্বজুড়ে অধিকাংশ মানুষের মুক্তি মেলেনি ঐসব বদ্ধমূল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা-ধারার আঁকড় থেকে, সেটা খুব সহজেই অনুমেয়।

এখানে বলা আবশ্যক যে আজকের বিশ্বে যে অভাবনীয় দার্শনিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মানবিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটেছে তার মূলে রয়েছে মানুষের মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির প্রয়োগ। মানুষের যুক্তিভিত্তিক বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি

যখনই যুক্তিহীন ও বদ্ধমূল ধর্মীয়, সামাজিক ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়েছে, তখনই উক্ত সমাজের মানবিক উন্নয়ন সকল স্তরে ব্যাহত হয়েছে। যেমন, ধরা যাক প্রাক-খৃষ্টীয় প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার কথা। প্রাক-খৃষ্টীয় প্রায় আট শত বছর আগে (**800 B.C.**) থেকে প্রাচীন গ্রীসে মানুষের প্রজ্ঞাশীল চিন্তাশক্তির দ্রুত ও প্রভূত স্ফূরণ ঘটতে থাকে, যা ক্রমান্নয়ে দানাবেঁধে সেখানে সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের সঞ্চার ঘটায়। এমনকি সেই খৃষ্ট-পূর্ব গ্রীসে গণতন্ত্র, মানবতাবাদ এবং মানবাধিকারের মৌলিক ধারণাও জন্ম নেয়। সর্বস্তরে মানবিক উন্নয়নের এই ধারা ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করে তৎকালীন ইউরোপকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, ঐশ্বর্য্যে ও প্রযুক্তিতে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক উর্ধ্বে নিয়ে যায়। কিন্তু মানুষের এই মুক্তচিন্তা ক্রমেই আবদ্ধ হতে থাকে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও অর্জিত চিন্তাধারার বেড়াজালে এবং বিশেষ করে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে অবৈজ্ঞানিক ও বদ্ধমুল খৃষ্ট ধর্মীয় মতবাদ সারা ইউরোপে দ্রুত প্রসার লাভ করে মানূষের মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তনকে শক্ত হাতে পঙ্গু করে দেয়। ফলে প্রাক-খৃষ্টীয় গ্রীসে উদ্ভূত প্রগতিশীল চিন্তাধারা গ্রীসে ও প্রতিবেশী ইউরোপে প্রগতি ও উন্নয়নের যে জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল, তা ক্রমেই স্তমিত হয়ে পড়ে বিশেষতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে যখন প্রতিক্রিয়াশীল ও কুসংকারাচ্ছন্ন খৃষ্ট ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা মানুষের মুক্ত বুদ্ধি ও চিন্তা চর্চার গলাটিপে ধরে। আর তখন থেকেই সেখানে মানবিক উন্নয়নের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সূচনা হয় পাশ্চাত্যের তথাকথিত *‘অন্ধকার যুগ’* (Dark Age) -এর।

খৃষ্ট ধর্মীয় বদ্ধমূল ও প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের আঁকড়ে আবদ্ধ অন্ধকার যুগীয় ইউরোপীয় সমাজ ও সভ্যতাকে স্থবিরতা ও চার্চ যাজকদের অন্যায়-অনাচার থেকে মুক্তিলাভের পিছনেও একচ্ছত্র ভূমিকা রয়েছে কিছু মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সাহসী ও ত্যাগশীল বৈপ্লবিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক মুক্তবুদ্ধি চর্চার, যদিও সময় লেগেছিল প্রায় ধীর্ঘ এক সহস্র বছর। এসব ব্যক্তিত্বের মধ্য থেকে ওয়াইক্লিফ, জন হাস, টমাস মুয়েনৎসার, উইনস্টানলির নাম উল্লেখ্য যাঁরা ক্যাথলিক চার্চের মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় মতবাদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক ও মানবতামুখী ব্যাখ্যা হাজির করেন, যার ভিত্তিতে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ইউরোপে জমাবাঁধে গরীব ভ্রাতৃসংঘ, ট্যাব্রাইট, লেভেলার, ডিগার্ল প্রভৃতি মূলত অসফল কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ জংগী আন্দোলন সমূহ তৎকালীন খৃষ্ঠীয় চার্চ-ভিত্তিক প্রতিক্রিয়াশীল যাজকীয় শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এঁদের সাথে যুক্ত হয় কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩), ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০) ও গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) প্রমুখের সাহসী ও ত্যাগশীল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, যা বাইবেলের *‘পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্রে/সূর্য পৃথিবীকে প্রতিনিয়ত প্রদক্ষিন করছে’* মতবাদকে নাকচ করে দিয়ে খৃষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাস ও চার্চভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থার গোড়াকে শক্ত হাতে নাড়িয়ে দেয় – যা পরবর্তিতে ইউরোপে *রেনেসাঁস, এনলাইটনমেন্ট* এবং *ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলুশনের* মত ঘটনার আবির্ভাব ঘটিয়ে সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, দর্শন-সাহিত্যে, অর্থনীতি-রাজনীতিতে ও শিল্প-প্রযুক্তিতে অসাধারণ উন্নয়ন বয়ে আনে।

উপরোল্লেখিত প্রাক-খৃষ্ঠীয় গ্রীসে ও প্রতিবেশী ইউরোপে দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে মুক্তবুদ্ধির চর্চা সেখানে ব্যাপক মানবিক উন্নয়ন সাধন করে। আবার *অন্ধকার যুগ-* পরবর্তি ইউরোপে মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তার চর্চা দানা বাঁধতে শুরু করে; ফলশ্রুতিতে, সেখানে *রেনেসাঁস, এনলাইটনমেন্ট* ও *ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলুশনের* মত যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে, যা সমগ্র বিশ্বের মানব সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। সে-সব ঘটনার আলোকে মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার চর্চা পাশ্চাত্য থেকে আগত বলেই ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেছে মানুষ সকল যুগে এবং পৃথিবীর সকল অঞ্চলে, হয়তো বা *স্বল্প পরিসরে ও নমনীয় গতিতে* - যা দানাবেঁধে বিশ্ব-সভ্যতার পটভূমিকায় কোন ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারেনি, যেমনটি হয়েছে পাশ্চাত্যের মুক্তবুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্রে। আমাদের ভারতবর্ষে এবং বিশেষত বাংগালী জাতির লৌকিক ইতিহাসেও প্রাক-আধুনিককাল থেকে ঘটে এসেছে এক প্রকৃষ্ট ও সমৃদ্ধ মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তার চর্চা, যা আধুনিক যুগের অনেক মুক্তচিন্তক উচ্চশিক্ষিত বাংগালী ব্যক্তিত্বকেও লজ্জিত, বিস্মিত ও গর্বিত করতে বাধ্য। বাংগালীর লৌকিক ঐতিহ্যের ভান্ডারে উঁকি মারলেই তার অনেক প্রমাণ মিলে।

প্রাচীন ভারতে মুক্তবুদ্ধির চর্চা

বাংগালী ভাষার আবির্ভাব-প্রাক ভারতবর্ষে সেই প্রাচীনকাল থেকেই প্রকৃত যুক্তিবাদী মুক্তবুদ্ধির চর্চা হয়ে এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ *'চার্বাক বা লোকায়ত'* দার্শনিকদের তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী মুক্তবুদ্ধি চর্চার কথা উল্লেখযোগ্য। *চার্বাকরা সেই প্রাচীনকালেই নিজেদেরকে প্রকৃষ্ট বস্তুবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এঁরা একাধারে নাস্তিক, ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী এবং জগতের প্রতি আসক্ত।* ভারতীয় দার্শনিক ধারায় এঁরাই ছিলেন সর্বাধিক বস্তুবাদী - একেবারেই আপোষহীন। চার্বাক দর্শনের মতে- *'ঈশ্বর ও ধর্ম আসলে পুরোহিতদের সৃষ্টি। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরোহিতরা অজ্ঞ ও অন্ধ-বিশ্বাসী মানুষদের শোষণ করত।'* মনে রাখা প্রয়োজন যে, মুক্তবুদ্ধি চর্চার জন্য বস্তুবাদী হওয়া আবশ্যক নয় এবং ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাসী ও ভাববাদী হিসেবে পরিচিত অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও যুক্তিবাদীতা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যেমন অন্ধকার যুগ-পরবর্তি ইউরোপের প্রগতিশীল মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রসিদ্ধ নায়ক ওয়াইক্লিফ, জন হাস, টমাস মুয়েনৎসার, উইনস্টানলি, কপারনিকাস, ব্রুনো ও গ্যালিলিও প্রমুখ সকলেই ছিলেন খৃষ্ট ধর্মে বিশাসী। একইভাবে গীতায় উল্লেখিত *'কোন কাজ করা উচিত আর কোন কাজ করা উচিত নয়, সে-বিষয়ে শাস্ত্রই পথ প্রদর্শক'* মতবাদটির স্পষ্ট প্রতিবাদ না করেও বৃহস্পতি সংহিতায় যুক্তিবিচারের আবশ্যকতাকে তুলে ধরা হয়েছে এভাবে - *'কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করেই কর্তব্য নির্ধারণ চলেনা, যুক্তিহীন বিচারে অবশ্যই ধর্মহানি ঘটে'*। ঋষি বশিষ্ঠ তো এর চেয়েও কড়া ভাষায় বলেছেন - *'স্বয়ং ব্রহ্মও যদি অযৌক্তিক কথা বলেন তবে তাও তৃণবৎ পরিত্যাগ করবে'*।

বৃহস্পতি সংহিতা বা **বশিষ্ঠ সংহিতা** তো অনেক পরবর্তীকালের রচনা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের আদিগ্রন্থ **ঋকবেদের** ঋষিদের মধ্যেও মুক্তবুদ্ধি চর্চার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রজাপতি সূক্ত, নাসদীয় সূক্ত, অস্যবামীয় সূক্ত - ঋকবেদের অন্তত এই তিনটি সূক্ত তো প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক্য- বাদেরই প্রকাশ ঘটিয়েছে। দেবতার অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে প্রজাপতি সূক্তে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়েছে - ***'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'*** অর্থাৎ ***কোন দেবতাকে হবি প্রদান করব***। নাসদীয় সূক্ত ও অস্যবামীয় সূক্তে দেবতার অস্তিত্ব তথা শাস্ত্রীয় সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়ে সংশয় ও অবিশ্বাস আরো স্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে নাস্তিক্যবাদের স্বপক্ষের যুক্তিসমূহ। প্রধান দেবতারূপে কল্পিত **ইন্দ্র** সম্পর্কেও ঋদবেগের স্তোত্র রচয়িতাদেরই কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে বসে আছেন - ***'অন্ন উৎপাদনের জন্য জনগণের প্রচেষ্টাই যথেষ্ট, এই প্রসংগে ইন্দ্রের স্তুতি অবান্তর মাত্র'***। এমনটিও বলা হয়েছে- ***'হে সংগ্রামেচ্ছুগণ, ইন্দ্র আছেন ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যভূত সোম উচ্চারণ কর'***। অন্যদিকে নেম ঋষি বলেন- ***'ইন্দ্র নামে কেহ নাই, কে তাহাকে দেখিয়াছে? আমরা কাহার স্তুতি করিব?'*** (ঋকবেদ সংহিতার ৮ম মন্ডলের ১০১ সূক্তের তৃতীয় ঋক।)

ঋকবেদ সংহিতার যুগটি ছিল মূলত কর্মকান্ডের যুগ। কর্মকান্ড মানে পার্থিব মঙ্গল ও সমৃদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে আগুন জ্বেলে তাতে ঘি তেলে (হবি প্রদান করে) দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করা, দেবতাদের প্রসংশাসূচক মন্ত্র ও স্তোত্র পাঠ করা। অর্থাৎ এ-যুগে যাগ-যজ্ঞ-হোমের মতো নানাবিদ আনুষ্ঠানিক কর্মকান্ডের মধ্যেই মানুষের কামনা চরিতার্থ করার উপায় সন্ধানকরা হয়েছে, জ্ঞান- চর্চার মধ্য দিয়ে যাচাই-বাছাই করে নেওয়ার মতো পরিবেশ-পরিস্থিতির তখনো সৃষ্টি হয়নি তবু মানুষ জ্ঞানবুদ্ধিহীন জড়পিন্ড বা ইতরপ্রাণী নয় বলেই একেবারে আদিম পরিবেশেও ভারতীয় মানুষের মাঝে প্রশ্নশীলতার প্রকাশ ঘটেছে। সে কারণেই, ঋকবেদ সংহিতার কর্মকান্ডের যুগেও দেবতাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে (এবং তাদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যাগ-যজ্ঞের সার্থকতা সম্পর্কে) প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

ঋকবেদ সংহিতার কর্মকান্ডের যুগ পেরিয়ে আসে *উপনিষদের জ্ঞানকান্ডের যুগ*। এ-যুগে যাগ- যজ্ঞের মতো অনুষ্ঠানের বদলে জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে সত্যসন্ধানের ঝোঁকটিই প্রবল হয়ে উঠে। উপনিষদগুলো যদিও ভাববাদের প্রতিষ্ঠাকেই দৃঢ় করতে সচেষ্ট হয়েছে, তথাপি যুক্তিবিচারের ধারায় সেগুলোতেও ঈশ্বর বা পরলোক সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাস নানাভাবে উঁকি মারতে থাকে। *যেমন কঠ, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, মুণ্ডক, প্রশ্ন - ইত্যাদি উপনিষদগুলোতে এমন ধরণের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে মুক্তবুদ্ধিই প্রবল হয়ে উঠে, শাস্ত্রীয় বিশ্বাসের সৌধটি ঝাঁকুনি-ঝুঁকুনিতে নড়বড়ে হয়ে পড়ে।* অপরদিকে *সাংখ্য, ন্যায়, যোগ, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত নামক আস্তিক দর্শনরূপে পরিচিত এই ছয়টি দর্শনকেও নাস্তিক্যের মোকাবেলা করতে হয়েছে মুক্তবুদ্ধি চর্চাকে স্বীকৃতি জানিয়েই।* আর সে-কারণেই এগুলোর কোনটাই শাস্ত্রীয় দেবতা বা ঈশ্বর বা স্বর্গ-নরকের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। প্রমাণের অভাবেই সাংখ্যদর্শনকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হয় এই বলে - ***ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ***। ন্যায় কিংবা যোগ, বৈশেষিক কিংবা

মীমাংসাকেও বস্তুবাদী যুক্তিবিচারের সামনে নানাভাবে জেরাগ্রস্থ হতে হয়েছে এবং পরিশেষে এসব দর্শন ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার পথচলা থেকে বিরত থেকেছে। একমাত্র **বেদান্ত দর্শনই** *সর্বব্যাপী এক ব্রহ্মের অস্তিত্ব ঘোষনা করে ভাববাদকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপন প্রয়াস পেয়েছে। তবে ধর্মশাস্ত্রে যে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রচার ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়, বেদান্ত সে-রকম ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি - সম্ভবও ছিল না।* তাই বেদান্তের ব্রহ্ম কোনমতেই ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখিত কোন দেবতা বা ঈশ্বর নন। ***সৃষ্টির উর্ধ্বে অবস্থিত কোন ব্যক্তিক সত্তা নয় বেদান্তের ব্রহ্ম।*** *সৃষ্টি, স্থিতি বা সংহার - এর কোনটাই সাধিত হয় না ব্রহ্মের দ্বারা; বরং ব্রহ্মই বিকশিত হয়ে সৃষ্টিতে পরিণত হয়। ব্রহ্মই হয়ে যায় সৃষ্টিশক্তির অপর নাম। জগৎই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই জগৎ - জগৎ বা সৃষ্টির সাথে ব্রহ্মের কোন পৃথকত্ব নেই।*

পৃথিবীর সকল দেশেই যুক্তিবিচারের ধারালো জেরার কাছে ভাববাদী দর্শনকে এভাবেই আত্মরক্ষা করতে হয়েছে। এ-রকম আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিয়ে ভাববাদী দর্শন যদিও-বা কোন রকমে আত্মরক্ষা করে টিকে থাকতে পারে, আনুষ্ঠানিক ও প্রথাবদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের প্রতিপত্তি কিন্তু এতে একেবারেই নড়বড়ে হয়ে পড়ে। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, **কোন রকম যুক্তিবাদ বা মুক্তবুদ্ধি চর্চাকে প্রশ্রয় দিলেই ধর্মশাস্ত্রকে তার আধিপত্য হারাতে হয়। ধর্মশাস্ত্র তাই সবসময়ই দর্শন-চর্চাকে নিরুৎসাহিত ও বাধাগ্রস্ত করতে চেয়েছে, যুক্তিবিচারহীন অন্ধবিশ্বাসের মাদক সেবন করিয়ে মানুষকে মৌতাতে আচ্ছন্ন রেখেছে।** ভারতবর্ষীয় ধর্মের প্রবক্তারাও এ-ধারার অনুসরণে গম্ভীর কণ্ঠে ফতোয়া জারি করেছে - ***'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর'***। তবুও লোকসাধারণ সবসময় বিনা প্রতিবাদে এ-রকম বিশ্বাসের মাদক গলধঃকরণে রাজি হয়নি; সুযোগ পেলেই মুক্তবুদ্ধির ধারালো অস্ত্র হাতে নিয়ে বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে।

বৈদিক যুগের শেষ ভাগের ভারতবর্ষেও এ-রকম বিদ্রোহই দেখা দিয়েছিল। সে-সময়ে মুক্তবুদ্ধি চর্চাকে ভিত্তি করে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মশাস্ত্র ও ভাববাদী দর্শনকে যাঁরা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে পূরণ কস্যপ, মকখলি গোসাল, পকধ কচ্চায়ন, নিগণ্ঠনামপুত্ত, অজিত কেসকম্বল প্রমুখ বিদ্রোহী চিন্তানায়কের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিপ্লবী (***radical***) ছিল অজিত কেসকম্বল ও তাঁর অনুসারীবৃন্দের চিন্তাধারা। **তাঁরা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে ঃ *''যাকে আত্মা বলা হয়েছে তা আসলে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ - এই চার মহাভূতের দ্বারা নির্মিত এবং মাতাপিতা থেকে উৎপন্ন; দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও ছিন্ন ও বিনষ্ট হয়ে যায়, মৃত্যুর পর এর আর কোন অস্তিত্বই থাকে না।''***

মুক্তবুদ্ধি চর্চার এ-রকম পটভূমিতেই প্রথমে উদ্ভব ঘটে জৈন ও পরে বৌদ্ধ মতবাদের। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রচিন্তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গৌতম বুদ্ধ জোর গলায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে জল্পনা-কল্পনা বা তর্কবিতর্ককে অর্থহীন বলে ঘোষণা করলেন, ঈশ্বর

বা পরলোকে বিশ্বাসকে বাদ দিয়েই মানুষের জীবন চলার দিকনির্দেশনা দিলেন - কুসংস্কারের বিপরীতে যুক্তিবিচারকে উর্ধ্বে তুলে ধরলেন। ইতিহাসের মঞ্চে বাংগালী জাতির অনুপ্রবেশ ঘটে বুদ্ধের চিন্তার উত্তরাধিকার নিয়েই। নানান রূপ ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সেই উত্তরাধিকারই বাংগালীর মুক্তবুদ্ধি চর্চার অবয়বটি নির্মাণ করে দিয়েছে। বাংগালীর লৌকিক ঐতিহ্যেও সেই উত্তরাধিকারটিই বিধৃত দেখতে পাই। বাংগালীর লৌকিক ঐতিহ্যের ভাণ্ডারে সন্ধানী দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাব ঃ পাশ্চাত্য তথা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কিছুসংখ্যক বাংগালীর মধ্যেই-যে মুক্তবুদ্ধির চর্চা সীমিত থেকেছে এমন ধারণা মোটেই সত্য নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে প্রাক-আধুনিককাল থেকেই বাংলার লোকসাধারণ মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদীতার চর্চা করে এসেছে - নানা প্রতিকূলতার চাপে কখনো কখনো সে স্রোত- ধারা ক্ষীণ বা অবদমিত হয়েছে, কখনো-বা উন্মার্গগামীও হয়েছে; কিন্তু কখনোই সে-স্রোত একেবারে শুষ্ক, রুদ্ধ বা স্তব্ধ হয়ে যায়নি।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মতবাদের প্রবর্তক কার্ল মার্কস বলেছেন - ***‘ধর্মের সমালোচনা হলো সমস্ত সমালোচনার সিদ্ধান্তসূত্র’***। তিনি এমনও দাবী করেছেন - ***‘ধর্মের সমালোচনাই হবে এই পার্থিব জীবনের সমালোচনার সুত্রপাত’***। বাংগালীর বুদ্ধিচর্চার একেবারে গোড়াতেই কিন্তু এ-রকম *‘সমালোচনার সূত্রপাত’* আমরা প্রত্যক্ষ করি। *ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ব্রাহ্মণকেই সমস্ত মানুষের উপরে স্থান দিয়েছে - ব্রহ্মার মুখ থেকেই ব্রাহ্মণের জন্ম, এ-ধরনের অতিকথার প্রচার করে। অন্যদিকে ক্ষৈত্রিয়ের জন্ম ব্রহ্মার বাহু থেকে, বৈশ্যের জন্ম ব্রহ্মার উরু এবং শূদ্রের জন্ম উরু পা থেকে - তাই ব্রাহ্মনেতর মানুষেরা জন্মসূত্রেই নিকৃষ্ট।* ***‘বেদ পাঠের মাধ্যমেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে’*** - একথা যেমন বলেছে, তেমনি ব্রাহ্মণেতর মানুষের জন্য বেদ পাঠ নিষিদ্ধ করে তাদের ব্রাহ্মণ হওয়ার পথ বন্ধও করে দিয়েছে। **ব্রাহ্মণ যজ্ঞের আগুন জেলে তাতে ঘৃতাহুতি দেয় এবং হোম করে** - এসব অনুষ্ঠান নাকি তাদের স্বর্গপ্রাপ্তির বা মুক্তিলাভের পথ করে দেয়। এটা সুস্পষ্ট যে, *যুক্তিবিচারহীন বিশ্বাসের ধুম্রজাল দিয়ে সামাজিক বৈষম্যকে চিরস্থায়ী করে রাখার, ব্রাহ্মণ-আধিপত্যকে নিরংকুশ করে রাখার ও সাধারণ মানুষের জ্ঞানগর্ভের পথকে কন্টকাকীর্ণ করে রাখার সকল ব্যবস্থাই ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্র করে রেখেছে।* কিন্তু তাতেও কি শেষ রক্ষা হয়েছে?

শেষ রক্ষা যে হয়নি তার ভুরি ভুরি প্রমাণ মজুদ রয়েছে আমাদেরই লৌকিক ঐতিহ্যের ভাণ্ডারে। সে ভাণ্ডারে উঁকি দিলেই দেখতে পাই যে, লোকসাধারণ কোন মতেই শাস্ত্রের সব অনুজ্ঞা বিনা যাচাই বা প্রতিবাদে মেনে নেয়নি - ***যুক্তিবিচারের ধারাল অস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রীয় সব বিধিবিধান- কে তারা কেটে ফালা ফালা করে দিয়েছে; আবার কখনো কখনো সে-সবকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছে।*** এখন থেকে কমপক্ষে এক হাজার বছর আগে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের নির্মোক ভেঙ্গে যখন বাংলাভাষার সবেমাত্র অভ্যুদয় ঘটছে, তখনকার রচিত **দোহাকোষ** ও **চর্যাপদ**

সমূহেও বাংগালী লোকসমাজে মুক্তবুদ্ধি ও প্রজ্ঞাশীল চিন্তাধারা চর্চার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দোহাকার **সরহপাদের** কিছু উক্তির উল্লেখই যথেষ্ট। অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ্ণ ভাষায় ব্রাহ্মণ রচিত শাস্ত্রবিধানের প্রতিবাদ করে তিনি বলেছেন ঃ

** ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল - যখন হইয়াছিল তখন হইয়াছিল, এখনতো অন্যেও যে-রূপে হয় ব্রাহ্মণও সেই রূপেই হয় - তবে ব্রাহ্মণত্ব রহিল কি করিয়া?
** যদি বল, বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তবে অন্যেরাও তাহা পড়ুক - আর তারা পড়েও তো, ব্যাকরণের মধ্যেও তো বেদের শব্দ আছে।
** আর আগুনে ঘি দিলে যদি মুক্তি হয়, তা হইলে অন্য লোকেও দিক না। হোম করিলে মুক্তি যত হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয়, এই মাত্র।
** তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বলে। প্রথমে অথর্ববেদের সত্তাই নাই, আর অন্য তিন বেদের পাঠও সিদ্ধ নহে, সুতরাং বেদের প্রামাণ্য নাই। বেদ তো আর পরমার্থ নয়, বেদ তো আর শূন্য শিক্ষা দেয় না - বেদ কেবল বাজে কথা বলে।

সরহপাদের এই বক্তব্যকে কোন ব্যক্তিবিশেষের বিচ্ছিন্ন উক্তি মনে করা কোন মতেই ঠিক হবে না। বরং বলা উচিত - লোকসাধারণের মুক্তবুদ্ধি চর্চাজাত চিন্তা-ভাবনারই প্রতিনিধিত্ব করেছেন সরহপাদ। ব্রাহ্মণেরা তাদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্যে যে-সব কুযুক্তি উত্থাপন করে থাকে, শোষিত-বঞ্চিত মানুষের পক্ষ থেকে সে-সবেরই দাঁত-ভাংগা জবাব সরহপাদের কথাগুলো। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মিশেলে এখানে যুক্তিবিচার পেয়েছে এক নতুন মাত্রা। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধেই শুধু নয়, বস্তুবাদের পক্ষে লোকায়তিক যুক্তিবিচারের ঐতিহ্য-অনুসৃতিতেও প্রকৃষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তিনি ঃ *‘কিন্তু যখন কোন পদার্থই নাই, যখন বস্তুই বস্তু নয়, তখন ঈশ্বরও তো বস্তু - তিনি থাকেন কেমন করিয়া। ব্যাপকের অভাবে তা ব্যাপ্য থাকিতে পারেনা। বলিবে, কর্তা বলিয়া ঈশ্বর আছেন, যখন বস্তুই নাই তখন ঈশ্বর কি করিলেন?’* {হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বৌদ্ধগান ও দোহা’ থেকে সরহপাদের উক্তি দুটোর বাংলা গদ্যরূপ এখানে উদ্ধৃত হল।}

হাজার বছর পূর্বেকার বাংলায় সরহপাদের মতো যে-সব দোহাকোষ রচয়িতা কায়েমী স্বার্থবাদী ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে নানাভাবে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, তাঁরাছিলেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য। সিদ্ধাচার্যরা প্রায় সবাই ছিলেন নিম্নবর্ণের মানুষ। নিম্নবর্ণের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করেই তো প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ মতবাদের উদ্ভব ঘটেছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য ভারতে ও ভারতের বাইরে প্রচারিত বৌদ্ধ মতবাদ আর নিম্নবর্ণের অধিকারে থাকে না, সে-মতবাদ বণিক শ্রেণীর স্বার্থসাধক হয়ে যায়। এতে করে তথাকথিত শিষ্ট সমাজের হাতে বৌদ্ধ মতবাদের লৌকিক অন্তঃসারের ঘটে বিনষ্টি। তথাপি অন্যত্র যাই হোক, বাংলায় বৌদ্ধ ঐতিহ্য লোকসমাজের লৌকিক চেতনাকেই আশ্রয় করে থাকে। *‘অভিজাত বৌদ্ধ ধর্ম’*-এর বিপরীতে বাংগালীর *‘লৌকিক বৌদ্ধ ধর্ম’* থেকেই উদ্ভূত হয় বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযানের মতো নানান অনভিজাত লোকায়ত ঘরানার। নাথ পন্থাও লৌকিক বৌদ্ধমতেরই বিবর্তনজাত। লৌকিক বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদেরই ক্রমবিবির্তন ঘটে

'বৈষ্ণব সহজিয়া' ও *'বাউল'* পন্থায়। এ ছাড়া বাংগালী লোকসমাজে উদ্ভূত অন্যান্য বিদ্রোহী মতবাদও বৌদ্ধদের মুক্তবুদ্ধি চর্চার ঐতিহ্য থেকেই রস আহরণ করে পুষ্ট হয়েছে। বাংগালীর লোকবৃত্তকে ভাল করে পর্যবেক্ষন করলেই আমরা আমাদের লোকসমাজে মুক্তবুদ্ধি চর্চার বেগবান প্রবাহটির সঙ্গে পরিচিত হতে পারি।

বাংলায় বিভিন্ন ধর্মের অনুপ্রবেশ ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার ধারা-প্রকৃতি

অষ্টম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত বাংলায় রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শাসক- বৃন্দ। দশম শতাব্দীর পর দুশো বছর ধরে চলে ব্রাক্ষণ্য ধর্মাবলম্বী সেনবংশীয়দের শাসন এবং ত্রয়োদশ শতক থেকে ইসলামের রাজত্ব। কিন্তু বাংগালীর প্রধানতঃ গ্রামকেন্দ্রিক ও কৃষিভিত্তিক জীবন-যাপন প্রণালী হওয়ার কারণে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসকদের সাথে তাদের সম্পর্ক থেকেছে মুলত বিচ্ছিন্ন বা ক্ষীন এবং সে-জন্যে শাসকবৃন্দের ধর্ম সাধারণ মানুষের জীবনদর্শনের উপর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেনি। যদিও শংকরাচার্য-কর্তৃক হিন্দু ধর্মীয় পূনর্জাগরনের পর লক্ষণ সেনের শাসনামলে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মের ব্যাপক বাড়াবাড়ি চলে বাংলার মানুষের উপর; আর ঠিক তখনই ইসলাম ধর্ম যখন বর্ণাশ্রমবিহীন সমতা ও ভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে বাংলায় আগমন করে, পূনরায় ব্রাক্ষন্য বর্ণাশ্রমের অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্যে বাংগালী জনগণ দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়। বস্তুতঃ হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম ইত্যাদি প্রথাগত ধর্ম আমাদের সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে রাষ্ট্রযন্ত্রের শাসকদের ধর্মকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু ঐ সব ধর্মগুলোই বাংগালী লোকসমাজে প্রবেশ করে ক্রমেই তাদের শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধতা হারিয়ে লৌকিক ধর্মে পরিণত হয়েছে। বাংগালীর লৌকিক ধর্মগুলো প্রথাগত শাস্ত্রধর্মের রক্ষণশীল তত্ত্ব ও বিধানকে বরাবরই প্রত্যাখান করেছে এবং সে-প্রত্যাখানে লোকসাধারণের কাণ্ডজ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধিই নির্ধারক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সে-জন্যই দেখা যায়, রাজানুধন্য পণ্ডিতবর্গ যখন ব্রাক্ষন্যশাস্ত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত শাস্ত্রগ্রন্থের দেশীয় ভাষায় অনুবাদ প্রচারের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছে, তখন বাংগালী লোকসাধারণ সে-ফতোয়াকে থোড়াই পরোয়া করেছে। যেমন, ***অষ্টাদশ পুরাণ কিংবা রামায়ণ যদি কেউ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করে, তবে সে নরকে পতিত হবে বলে ব্রাক্ষণ্য শাস্ত্রকাররা যে বিধান জারি করেছে তাকে অগ্রাহ্য করেই রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত সহ শাস্ত্র ও পুরাণ গ্রন্থের অজস্র দেশীয় অনুবাদ ও ভাষ্য প্রচার করেছেন লোকসমাজের কবিবৃন্দ।*** শাস্ত্রকারদের রক্তচক্ষু লোককবিদের মুক্তবুদ্ধি চর্চাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। আর কট্টরপন্থী শাস্ত্রব্যবসায়ীদের বদলে মুক্তমনা কবিরা বৃহত্তর সমাজের মান্যতা-শ্রদ্ধাও পেয়ে গেছেন সহজেই।

মুসলিম শাস্ত্রবেত্তারাও দেশীয় ভাষায় ইসলাম চর্চাকারীদের *'কাফের'* আখ্যা দিয়েছে। অথচ লোকসমাজের কবিরা সে-আখ্যাকে শিরোভূষণ করে নিয়েই মাতৃভাষা বাংলায় রচনা করেছেন *'রসুল চরিত'*, *'নবীবংশ '*, *'নূরনামা'* ইত্যাদি কাব্যসমূহ। কবি **সৈয়দ সুলতান** মুক্তবুদ্ধির অনুগামী ছিলেন বলেই তাঁর *'নবীবংশ'* গ্রন্থে একান্ত উদারতা ও প্রথাবিরোধী নির্ভীকতার সংগে ইসলাম ধর্মীয় আনুগত্য ও

বিধানের উর্ধ্বে লোকায়ত ভাবাদর্শ ও স্বীয় কবিকল্পনাকে স্থান দিয়েছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও কৃষ্ণকেও নবী বলে গ্রহণ করে। তেমনি ভাবে *জ্ঞানপ্রদীপ* ও *জ্ঞানচৌতিশা* নামক তান্ত্রিক যোগ-বিষয়ক নিবন্ধও রচনা করে গেছেন তিনি। তন্ত্র ও যোগ - এ দুই-ই অত্যন্ত প্রাচীন লোকায়ত বস্তুবাদী ঐতিহ্যের ধারাবাহী এবং তা অবশ্যই ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের বা শরীয়তি ইসলামের পরিপন্থী। কাজেই স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির অনুসারী ছিলেন বলেই **সৈয়দ সুলতান** প্রথাবদ্ধ ধর্মীয় অনুশাসনের বিরোধীতায় মোটেই ইতস্ততঃ করেন নি। সৈয়দ সুলতানের মতই সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় সংকারকে উপেক্ষা করেই শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ মর্তুজা ও নাসির মামুদের মত কবিরা রচনা করেছেন *'গোরক্ষ বিজয়', 'সত্যপীরের পুঁথি'* ও *'রাধাকৃষ্ণ'* বিষয়ক পদাবলী। এঁদের মুক্তবুদ্ধি শাস্ত্রীয় রক্ষণশীলতা ও সাম্প্রদায়িক কুপমণ্ডুকতার আগল ভেঙে মানবমুক্তির পথকেই অবারিত করে দিতে চেয়েছে এবং বাঙ্গালীর লৌকিক ঐতিহ্যকে অসামান্য সম্পদে পরিপূর্ণ করেছে।

ধর্মীয় গোঁড়ামির খোলসে আবৃত ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার একান্ত বিরোধী কট্টর ধর্মাবলম্বীরা অবশ্যই এ-সবের মধ্যে বুদ্ধির মুক্তির কোন আলামতই খুঁজে পাবে না। ধর্মাশ্রয়ী হওয়ার কারণেই তারা বরং এ-সবকে *প্রতিক্রিয়াশীল* বলেই আখ্যা দেবে; ধর্মচিন্তার সাথে মুক্তবুদ্ধির কোন সংযোগকেই তারা মেনে নিতে পারবে না।

মুক্তবুদ্ধিকে একটা যান্ত্রিক দৃষ্টিতে দেখা কিন্তু কোন মতেই সঠিক ও ইতিহাস সম্মত নয়। মানব ইতিহাসের দিকে তাকালে সহজেই দেখা যায় - পৃথিবীর প্রত্যেক জনগোষ্ঠির সমাজজীবনেই মুক্তবুদ্ধির চর্চা ধর্মচেতনার একটি দীর্ঘ পর্যায় অতিক্রম করে অগ্রসর হয়েছে এবং মানব সমাজে সে-পর্যায়টির চূড়ান্ত অবসান এখনো ঘটেনি। বিশেষত কৃষিভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থার অধীন যে সমাজ, সে সমাজের চিন্তাচেতনা তো আজও অনিবার্য রূপেই ধর্মাশ্রয়ী। *ধর্মের আওতার ভেতরে থেকেই সে-সমাজের মানুষ বুদ্ধির চর্চা করে, সে-ধরনের চর্চার মধ্য দিয়েই তার বুদ্ধি শাণিত হয়ে উঠে ও ক্রমান্বয়ে তাতে মুক্তির ছোঁয়া লাগে*। ধর্মকেন্দ্রিক সমাজ কাঠামোতে মানুষের মুক্তবুদ্ধির চর্চা ধর্মকে কেন্দ্র করেই স্ফূর্তি পেয়েছে, প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামও ধর্মকেই আশ্রয় করেছে। সমাজের ধর্মীয় কর্তৃত্বশীল গোষ্ঠী ধর্মের যে-ব্যাখ্যা দিয়েছে, তা কখনই কর্তৃত্ব-বঞ্চিত লোকসাধারণের স্বার্থের পরিতোষক হয়নি বরং হয়েছে তার উলটো। তাই কর্তৃত্বহীনরা ধর্মের অন্যতর ব্যাখ্যা খুঁজেছে। সে-ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়েই তারা মার্কস-কথিত *ধর্মের সমালোচনা*-য় প্রবৃত্ত হয়েছে এবং সেই সমালোচনা দিয়েই শুরু হয়েছে তাদের মুক্তবুদ্ধির চর্চা। উপরোল্লেখিত প্রাচীন ভারতীয় (ঋকবেদ সংহিতার ও উপনিষেদীয় যুগে), বৌদ্ধ মতবাদীয় ও আদি বাংগালীয় (সরহপাদ প্রমুখের) মুক্তবুদ্ধি চর্চাতে এ-রকম একটি ধারাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে অর্থাৎ ধর্মের সমালোচনাকে কেন্দ্র করেই মুক্তবুদ্ধির চর্চার স্ফূরণ ঘটতে দেখি। মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসেও তো আমরা এ-রকম ঘটনাই ঘটতে দেখি। দু'হাজার বছর আগে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আর্তিকে ভাষারূপ দান করে উদ্ভব ঘটেছিল যে-খৃষ্টধর্মের, সেই খৃষ্টধর্ম সুবিশাল রোম সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্মে পরিণত হতেই জনগণের আশা-আকাংক্ষাকে চরমভাবে পদদলিত করতে থাকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে। ক্যাথলিক চার্চের যাজকীয়

শাসকতন্ত্র খৃষ্ট মতবাদের যে প্রতিক্রিয়াশীল ভাষ্য মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল তারই বিরুদ্ধে জনগণের পক্ষ থেকে খৃষ্ট ধর্মের বিপ্লবী ব্যাখ্যা হাজির করেছিলেন ইউরোপের বিপ্লবী বুদ্ধিজীবিবৃন্দ। এঁদের মধ্যে ছিলেন **ওয়াইক্লিফ, জন হাস, টমাস মুয়েনৎসার, উইনস্ট্যানলী** এবং এ-রকম আরো অনেকে। এঁরা আধুনিক অর্থে কেউই ধর্মবিরোধী বা নাস্তিক বা বস্তুবাদী ছিলেন না। তবুও ধর্মে আস্থা রেখেই এঁরা যেভাবে মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেছিলেন তার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। বরং এসব নির্ভীক বুদ্ধিজীবিদের বিপ্লবী ধর্ম-ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করেই তো পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ইউরোপে খৃষ্টচার্চীয় শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে গড়ে উঠে গরীব ভ্রাতৃসংঘ, ট্যাবরাইট, লেভেলার, ডিগার্ল নামক জঙ্গী আন্দোলন সমূহ। এই আন্দোলনগুলো তাৎক্ষণিক সফলতা না পেলেও পরবর্তিকালের অনেক বেগবান ও সফল বিপ্লবের প্রেরণার উৎস হিসেবে যে কাজ করেছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ধর্মের আওতায় অবস্থান করেও ধর্মের যে প্রগতিমুখী সমালোচনা প্রাগাধুনিক কালের চিন্তাবিদগণ করেছিলেন কিংবা বিদ্রোহী ধর্ম-চেতনাকে আশ্রয় করে মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লোকসাধারণ যে-সব আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সে-সবের গুরুত্ব উপেক্ষনীয় নয় কোনমতেই। এ-কালের ও ভাবীকালের মানুষের মুক্তবুদ্ধি চর্চা হবে এরকম সব মুক্তবুদ্ধি চর্চার লৌকিক ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকার মাত্র।

বাউল মতবাদে মুক্তবুদ্ধির চর্চা

ইউরোপের সঙ্গে প্রতিতুলনায় বাংগালী লৌকিক ঐতিহ্য তো অনেক বেশী সমৃদ্ধ। বিশেষ করে শাস্ত্রীয় ধর্মের অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপনের ব্যাপারে আমাদের লোকসাধারণ যে বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, সাহস ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে অন্যত্র তার তুলনা মেলা ভার। *'নিম্নবর্গের মানুষের ধর্মভাবনা যে উচ্চবর্গীয় ক্ষমতাবানদের থেকে পৃথক হয়ে থাকে'* - এ কথা ইতালীর বিপ্লবের চিন্তানায়ক **গ্রামসি**ও বলে গেছেন। এ-পার্থক্য কখনো কখনো প্রকট হয়ে উঠে এবং তা নিম্নবর্গের মানুষের মাঝে ভিন্নধর্মী মতবাদের উদ্ভব ঘটাতে পারে। আমাদের ধর্মীয় ইতিহাসের ভিতর উঁকি মারলে - এ-ধরনের ঘটনা আমাদের দেশেই বেশী স্পষ্টতা ও তীব্রতা নিয়ে প্রকাশিত হতে দেখি। উদাহরণ স্বরূপ, প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা বর্ণাশ্রয়ী ও প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ্যধর্মের ঈশ্বর- বিশ্বাসকে নির্মমভাবে আক্রমন করে যে **'লৌকিক বৌদ্ধ ধর্ম'**-র বিবর্তন ঘটায়, তা পরবর্তিতে **'বৈষ্ণব সহজিয়া'** হয়ে লৌকিক ইসলামের সংযোগে **'লৌকিক বাউল'** তত্ত্বে রূপ নেয়, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বাউল মতবাদে তো লোকসাধারণের যুক্তিবাদী মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তন চর্চার এক অভাবনীয় স্বাক্ষর রয়েছে, যা প্রচলিত ধর্মানুশাসনকে এবং বিশেষত ইসলাম ধর্মীয় ধ্যানধারণাকে সুনিপুন প্রশ্নবানে, ভ্রুকুটিতে ও অবজ্ঞায় নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দিয়েছে। যেমন, বাউল-শিরোমণি লালন শাহের শিষ্য দুদ্দু শাহের মুখে শুনি -

> "বস্তুকেই আত্মা বলা যায়
> আত্মা কোন অলৌকিক কিছু নয়।''

অথবা

“বস্তু ছাড়া নাহি আর আল্লা কিংবা হরি।
এহি মত দেখ সবে নর-বস্তু ধরি॥
রজঃবীর্য এই দুই বস্তু যেবা চিনে।
লালন সাঁইজিকে সেই জন চিনে॥”

পার্থিব বস্তুবাদের এই চরম বহির্প্রকাশ আমাদের মত আধুনিক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের পাণ্ডিত্য- অভিমানেও মস্ত বড় ধাক্কা লাগাতে বাধ্য। সেই ধাক্কা সামলে নিয়ে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাই - দুদ্দু শাহের গানে প্রকাশ ঘটেছে যে সরল বস্তুবাদের, যীশু খৃষ্ট ও বুদ্ধের জন্মেরও অনেক আগে থেকেই দক্ষিন এশীয় উপমহাদেশের ঐতিহ্যে সেই বস্তুবাদ সুদৃঢ় শিকড় গেড়ে আছে - আর সেই বস্তুবাদেরই প্রবাহমানতা বাংগালীর লৌকিক ঐতিহ্য। আউল-বাউলদের দেহতত্ত্বের গান তো সেই সরল বস্তুবাদেরই সনিষ্ঠ অনুসৃতি। যেমন, *‘যা নেই ভাণ্ড, তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে’* , অর্থাৎ মানুষের দেহে যা নেই, তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও নেই। বস্তুই বিশ্বের মূল উপাদান, বস্তু-ব্যতিরিক্ত অস্তিত্বহীন কোনো কিছুর অনুসন্ধান একান্তই নিস্ফল। বাউল তত্ত্ব বিশ্বাস করে সেই বস্তুবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। কাজেই বাউল বলেন-

অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছু নাই।
দেব-দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে॥

নারীর রজঃ ও পুরুষের বীর্য - এই দুয়ের সংযোগেই সৃষ্টি হয় নর বা মানুষের দেহ, এই দেহরূপ বস্তুর বাহিরে অন্য কোন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা অর্থহীন। দেহাত্মবাদের এই বোধ প্রথাগত ধর্মীর ঈশ্বরের সৃজনকে মানব-সৃষ্ট বলেই রায় দেয় এবং লালন শাহ (১৭৭৮-১৮৯০) স্পষ্টই বলে ফেলেন -

আল্লা হরি ভজন পূজন
সকলি মানুষের সৃজন
অনামক অচিনায় কখন
বাগিন্দ্রিয় না সম্ভবে।

‘মানুষের সৃজন’ এই আল্লা কিংবা হরিকে নিয়েও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের কর্তৃত্বশীল গোষ্ঠী নানান ভেদ-বিভেদের সৃষ্টি করেছে। সেই ভেদ-বিভেদেরই প্রকাশ বিভিন্ন প্রথাগত ধর্মে, আর সেই সব ধর্মকে অবলম্বন করেই সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষের। বিভিন্ন সম্প্রদায় আপন আপন ধর্মকেই ‘সত্য’ বলে প্রচার করে এবং ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে বাদ-বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছে। প্রকৃত মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তনের আশ্রয় নিলেই এ-রকম সাম্প্রদায়িক ধর্ম-ব্যাখ্যার ফাঁক-ফোঁকর গুলো ধরা পড়ে যায়। সেই প্রকৃষ্ট মুক্তবুদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করেই লালন শাহ গেয়ে যান -

ধর্মের উদ্দেশ্য যদি হয়
আল্লার নির্ণয়
তাহলে সকল ধর্মেই
তারে পাওয়া যায়॥
এক লক্ষ চব্বিশ হাজার
পয়গম্বরের হলো খবর
ঊনিশটি নাম কোরান-ভিতর
আর সকল কোথায়?
তালেবুল মওলা যে হয়
সকল ধর্মেই সে তারে পায়
আল্লা কারো একান্ত নয়
চেয়ে দেখরে - এই দুনিয়ায়॥

সহজ-সরল গানের ভাষায় *'অশিক্ষিত' 'গ্রাম্য ফকির'* লালন শাহ এ-রকম অনেক চিন্তনীয় তত্ত্ব ও সত্যেরই উদঘাটন ঘটিয়েছেন। হিন্দু ও মুসলমানের স্বর্গ বা পরলোক সম্পর্কীয় অলিক ভাবনার প্রতিও তিনি সমালোচনার তীর নিক্ষেপ করেছেন এভাবে ঃ

হিন্দু-মুসলমান দুইজন আছে
দুই ভাগে॥
বেহেশতের আশায় মুমিনগণ
হিন্দুদিগের স্বর্গেতে মন
টল কি অটল মোকাম সেহি
লেহাজ করে জান আগে।
ফকিরী সাধন করে
খোলাসা রয় হুজুরে
ভেস্তের সুখ ফাটক সমান
কার-বা তাই ভাল লাগে॥

প্রথাগত ধর্মগুলোতে যে স্বর্গ বা বেহেস্তকে অতি লোভনীয় রূপে তুলে ধরা হয়েছে, তাকেই কিনা অবলীলায় *'ভেস্তের সুখ ফাটক সমান'* রায় দিয়ে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছেন লোকধর্ম তথা লোকসমাজের প্রতিনিধি লালন শাহ। এখানেই শেষ নয় - ইসলামে নারীকে ইহলোকেও যেমন অনেক মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে, তেমনি পরলোকেও যে তার প্রাপ্তি সম্পর্কে কিছুই ভাবা হয়নি, সে বিষয়টিও সুবিচক্ষন লোককবির দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। তাই ধর্মধ্বজীদের কাছে তাঁর বিদ্রূপ ভরা বিব্রতকর প্রশ্ন -

মিঞা ভাই, কি কথা শুনাইলেন ভারী
হবে নাকি কিয়ামতে আযাব ভারী।

নরনারী ভেস্ত মাঝার,
পাবে নাকি সমান অধিকার
নরে পাবে হুরের বহর
বদলা কি তার পাবে নারী?

সকল ধর্মশাস্ত্রেই এক ন্যায়-বিচারক ঈশ্বরের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষে মানুষে যে ভেদ-বৈষম্য বিরাজ করে, তা দেখে স্বাভাবিকভাবেই ঈশ্বরের ন্যায়-বিচার সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। ন্যায়-বিচারক খোদার দুনিয়াতে যে-মানুষ প্রতিনিয়ত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে যায় এবং বিনা দোষে প্রবলের নিপীড়নে উৎপীড়িত হতে থাকে, সেই মানুষ কি-করে পরলোকে একই খোদার নিকট সুবিচার পেয়ে স্বর্গলোকে যাওয়ার ভরসা পেতে পারে? বৈষম্য-পীড়িত সেই মানুষের পক্ষ থেকেই লালন শাহের ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা -

কেমন ন্যায়-বিচার খোদা বল গো আমায়।
তাহলে ধনী-গরীব কেন এ ভূবনে রয়।
ভালমন্দ সমান হলে
আমরা কেন পড়ি তলে
কেউ দালান কোঠার কোলে
শুয়ে নিদ্রা যায়॥
সেই আমরা মরণের পরে
যাব নাকি স্বর্গ পুরে
কে মানিবে এ সব হেরে
এই দুনিয়ায়?

পারিপার্শ্বের এ-রকম অসংগতি সম্পর্কে প্রশ্ন যুক্তিতর্ক-ভিত্তিক তুলেই লালন শাহের মতো লোকসমাজের প্রতিনিধিরা ক্ষান্ত থাকেন নি, এ-সব থেকেই তাঁদের মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও সৃজনশীল কল্পনার বিস্তার। সকল প্রকার অসংগতিমুক্ত এক বৈষম্যহীন আদর্শ সাম্য সমাজের আর্তিই লালন শাহ তাঁর একটি গানে -

এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে।
যেদিন হিন্দু মুসলমান
বৌদ্ধ খ্রীস্টান
জাতিগোত্র নাহি রবে॥
শোনায়ে লোভের বুলি
নেবে না কাঁধের ঝুলি
ইতর আশরাফ বলি
দূরে ঠেলে না দেবে॥
আমির ফকির হয়ে এক ঠাঁই
সবার পাওনা খাবে সবাই
আশরাফ বলিয়া রেহাই

ভবে কেউ নাহি পাবে॥

সাম্য সমাজের এ-রকম নিষ্ক্রিয় আর্তির মধ্যেই লোকসমাজের বুদ্ধিচর্চা সীমিত থাকেনি, কিংবা তার কল্পনা-কুশলতা এখানেই নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। বাউলদেরও অনেক আগেই ষোড়শ শতকের মঙ্গলকাব্যের কবিরা এমন এক কল্পিত রাজ্যের মানস-সৃজন ঘটিয়েছিলেন যাকে বলা যেতে পারে **'সব পেয়েছির দেশ'**। মঙ্গলকাব্যে সেই **'সব পেয়েছির দেশ'** সৃষ্ট হয়েছে নিম্নবর্গীয় নায়কদের হাতে। এ-রকমই একজন নায়ক চণ্ডীমঙ্গলের ***কালকেতু***, যাঁর স্বপ্নের সাম্য-রাজ্যের স্বরূপটি এ-রকম -

"দুঃখী দরিদ্র তাতে এক নাহি জানি
কনক কলসী ভরি প্রজা খায় পানি॥"

এবং

"যত বেসে লোক নাহি রোগ শোক
সভার কৌশেয় বাস।
কুমকুম চন্দন অঙ্গে বিলেপন
মাল্য শোভে কেশপাশ॥
শংক বেণু বীণা মৃদঙ্গ বাজনা
বাজে সভাকার ঘরে
হয় নাট গীত সবে পুলকিত
মঙ্গল প্রতি বাসরে॥"

বাস্তবে এ-রকম রাজ্যের অস্তিত্ব অবশ্যই নেই। কিন্তু বাস্তবে যা নেই, মানুষ তো তাই সৃষ্টি করতে চায়। মানুষের প্রকৃত দর্শন হচ্ছে - **বিরূপ বাস্তবকে বদলিয়ে নয়া দুনিয়া সৃষ্টির দর্শন**। সেই বদলানোর কাজটা প্রথম করে সে কল্পনায় একটা আকর্ষনীয় **'স্বর্গরাজ্য'** বা **'*ইউটোপিয়া*'** সৃষ্টির মাধ্যমে। পরবর্তিতে মানুষ ক্রমাগত সেই *ইউটোপিয়া*'কে সামনে রেখে তার প্রয়াসকে অব্যাহত রাখে। বাঙ্গালী লোকসমাজও *ইউটোপিয়া* সৃষ্টিতে মোটেই পীছিয়ে থাকেনি। কালকেতুর গুজরাট রাজ্য এ-রকমই একটি *ইউটোপিয়া* মাত্র। এ-রকম আরেকটি *ইউটোপিয়া* ধর্মমঙ্গলের নায়ক লাউসেনের ময়নাগড় রাজ্য। এদেশের মানুষ আবহমানকাল ধরেই এক সত্যযুগের কল্পনা করে এসেছে যেখানে অসত্য নেই, অধর্ম নেই, অন্যায় নেই, অসাম্য নেই। মানুষের কল্পিত *ইউটোপিয়া*কে বাস্তবতা দানের প্রয়াস কখনো কখনো সফল হয়ে বাস্তবেই সে *ইউটোপিয়া* মূর্ত হয়ে উঠে। যেমন, আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলে এ-রকম একটি ঘটনাই ঘটেছিল। সে-এলাকায় ***করম শাহ*** নামক এক লোকনায়কের নেতৃত্বে *'পাগলপন্থা'* নামক একটি লোকধর্ম বা লৌকিক আন্দোলন গড়ে উঠে। পাগলপন্থার মূল কথা ছিল এ-রকম ঃ

'আল্লাহর সৃষ্ট দুনিয়ার তাঁর বান্দা হচ্ছে মানুষ। আল্লাহর দৃষ্টিতে তাঁর সকল বান্দাই সমান, কেউ ছোট কেউ বড় নয়। আর আল্লাহর জমিনেও তাঁর সকল বান্দার সমান অধিকার। কোনো জমিদার বা তালুকদারেরই সেই জমিনের খাজনা দাবি করার অধিকার নেই।'

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে করম শাহ তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার সুসংগ ও শেরপুর পরগনার আদি- বাসি ও বাংগালী কৃষকদের মধ্যে পাগলপন্থার প্রচার করতে থাকেন। তাঁর এই প্রচারে কৃষকরা প্রবলভাবে সাড়া দেয়, দলে দলে তারা পাগলপন্থার পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে। ১৮১৩ সালে করম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য *টিপু পাগলা* পাগলপন্থীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। টিপুর নেতৃত্বে সংগঠিত বিদ্রোহী কৃষকেরাপ্রথমে জমিদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তারপর ১৮২৫ সালে শেরপুরের জমিদারদের উৎখাত করে একটা স্বাধীন রাজ্যেরই পত্তন ঘটিয়ে ফেলে। এ-রাজ্যে কৃষকদের কোনো খাজনা দিতে হতনা, জমির উপর সকল কৃষকের ছিল সহজ ও সমান অধিকার। অর্থাৎ বাংগালী লোকসমাজের *ইউটোপিয়া*-ই একান্ত বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছিল লোকনায়ক টিপুর শেরপুর রাজ্যে।

লৌকিক সাম্যবাদের ধারক শেরপুর রাজ্য টিকে ছিল মাত্র দু'বছর। আধুনিক অস্ত্র-সজ্জিত ব্রিটিশ সৈন্যের হাতে টিপু পাগলার পরাজয় ঘটে এবং সে-রাজ্য আবার জমিদারদের হাতে চলে যায়। তবুও ১৮২৫ সালে আমাদের দেশে এমন একটি সাম্যবাদী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ সে-তাৎপর্য অনুধাবনে আমরা তেমন গরজ দেখাইনি। ১৮৭০ সালের মাত্র তিনমাস স্থায়ী ***'প্যারি কমিউন'*** আন্দোলনের কথা নিয়ে আমাদের আবেগ-উচ্ছ্বাসের অন্ত নেই কিন্তু তার চেয়েও ৪৫ বছর আগে বাংলার লোকসমাজের মানুষেরা ঘটিয়েছিল টিপু পাগলার সাম্যরাজ্যের মত অনেক বড় ঘটনার। অথচ এই ঘটনার প্রতি বাংলার মানুষের দৃষ্টি পড়েছে কদাচিৎ। কারণটা হল, আমরা আভিজাত্যের অভিমান ও সংস্কার সহজে ছাড়তে পারি না। **ছোটলোক**'রা **ভদ্রলোক**'দের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ও শক্তিমান হতে পারে - আমরা এমন কথা মেনে নিতে অনিচ্ছুক এবং সে-কারণেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সত্য বা ঘটনা আমাদের চোঁখে ধরা পড়ে না। সেই জন্যেই বাংগালীর লৌকিক ঐতিহ্যে বিভিন্ন ধারায় ঘটিত প্রকৃষ্ট মুক্তবুদ্ধি চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা অনেকটা অন্ধকারেই থেকে গিয়েছি।

লোকধর্ম ও **সঙ্গীত** - প্রধানত এই দুটো আধারকে আশ্রয় করেই বাংগালী লোকসমাজের মুক্তবুদ্ধির চর্চা স্ফূরণ লাভ করেছে। বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউলের পর ***কর্তাভজা, সাহেবধনী, খুশী বিশ্বাসী, বলাহাড়ি*** এবং এ-রকম আরো নানা ধারায় বাংলার নানা অঞ্চলে লোকধর্মের বিকাশ ঘটে। সবগুলো লোকধর্মই নিজের নিজের পদ্ধতিতে স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চা করেছে। এ-রচনার সীমিত পরিসরে এ-সবগুলো লোকধর্মের আলোচনা সম্ভব না হলেও বলাহাড়ি সম্প্রদায় ও তার প্রতিষ্ঠাতা বলরাম হাড়ির কথা কিছু না বললেই নয়। বলাহাড়ি লোক- ধর্মটি এখন বিলুপ্ত-প্রায়, অথচ উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার

গ্রামাঞ্চলে - বিশেষ করে মেহেরপুর, চুয়াদাঙ্গা, কুষ্টিয়া এলাকার নিম্নবর্গের বিপুল সংখ্যক মানুষ (হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে) এ-ধর্মের অনুসারী হয়েছিল। এঁরা প্রথাগত হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের প্রায় সকল বিশ্বাস ও আচারই পরিত্যাগ করেছিলেন। স্ত্রী ও পুরুষ ছাড়া মানুষের আর কোনো জাতিভেদ এঁরা মানতেন না। বলরাম হাড়ি নিজেও ছিলেন নিম্নবর্গের মানুষ, তাঁর জন্ম হয়েছিল সমাজের একেবারে নিম্নপ্রান্তে অবস্থিত এক অস্পৃশ্য গোত্রে। অথচ প্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত এই মানুষটির বুদ্ধি- বিবেচনা যে কতটা ধারাল ছিল, তারই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন উনিশ শতকের প্রখ্যাত লেখক ও চিন্তাবিদ **অক্ষয় কুমার দত্ত**। তাঁর ***‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’*** নামক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন :

> “একদিন বলরাম নদীতে স্নান করিতে গিয়া দেখিল, কয়েকজন ব্রাহ্মণ তথায় পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছেন। বলরাম নিজেও তাহাদের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী করিয়া নদীকূলে জলসেচন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলাই তুই ও-সব কি করিতেছিস? সে উত্তর করিল, আমি শাকের ক্ষেতে জল দিতেছি। ব্রাহ্মণ কহিলেন, এখানে শাকের ক্ষেত কোথায়? বলরাম উত্তর করিল, আপনারা যে পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছেন তাহারা এখানে কোথায়? যদি নদীর জল নদীতে নিক্ষেপ করিলে পিতৃলোকেরা প্রাপ্ত হন, তবে নদীকূলে জলসেচন করিলে শাকের ক্ষেত জল পাইবে না কেন?’’

বলরাম হাড়ির যুক্তিবিচারের এই ধারাটি প্রাচীন ভারতের চার্বাক বা লোকায়তিকদের বিচারবুদ্ধির কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। মুক্তবুদ্ধি চর্চার এই সুপ্রাচীন প্রবাহটি আমরা বাঙ্গালীর লোক- ধর্মগুলির পরতে পরতে সক্রিয় হতে দেখেছি এবং সংগীতই হয়েছে এ-সব লোকধর্মের মূল প্রকাশ-মাধ্যম। শুধু লোকধর্ম নয়, বাংগালী জাতির মনন, বুদ্ধি, কল্পনা - সব কিছুরই অভিব্যক্তি ঘটেছে মূলত সংগীতের মাধ্যমে। যাঁরা লালন-দুদ্দু শাহের মত কোনো বিশেষ লোকধর্মের অধিকারী ছিলেন না, তেমন লোককবি এবং সংগীতকাররাও মুক্তবুদ্ধিচর্চার লৌকিক ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকার বহন করে চলেন। তাঁদের সংগীতেও যুক্তিবিচারহীন ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচার এবং সামাজিক অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণা, প্রতিবাদ ও বিদ্রূপের প্রকাশ ঘটেছে। নিজেদের স্বাধীন বুদ্ধির নির্দেশেই মানুষের মর্যাদাকে তাঁরা উচ্চে তুলে ধরেছেন ধর্মশাস্ত্র বা ধর্মব্যবসায়ীদের ফতোয়াকে তোয়াক্কা না করে। যেমন, নেত্রকোনার প্রখ্যাত লোককবি জালাল উদ্দিন খাঁ অত্যন্ত নির্ভীকতার সাথে বলেন -

> মানুষ থুইয়া খোদা ভজ, এ মন্ত্রণা কে দিয়াছে
> মানুষ ভজ, কোরান খোঁজ পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে।

ধর্ম নিয়ে নানান বাদ-বিসংবাদ প্রসঙ্গে তাঁর সুস্পষ্ট মন্তব্য -

ধর্ম হতে এই জগতে দলাদলিই কেবল সার
ভুলে পড়ে জালাল ঘোরে মন হইল না পরিষ্কার॥
এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডময় একের মন্দ অন্যে কয়
করে কত হিংসার উদয় ঘৃণার চক্ষে চায় আবার,
কাগজের এই বস্তা ফেলে মহাসত্যের দেশে গেলে
ভেসে যাবে সব সলিলে ধর্ম বলতে নাই কিছু আর॥

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ায় নরসিংদী এলাকার একজন লোককবির অভ্যুদয় ঘটেছিল। তাঁর নাম বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী। *'পাগল দ্বিজদাশ'* ভণিতায় রচিত তাঁর গানগুলো এক সময় ঢাকা-ময়মনসিংহ-কুমিল্লা এলাকার গ্রামে-গঞ্জে প্রভূত লোকপ্রিয়তা পেয়েছিল। যে-গানে ঈশ্বরকে সম্বোধন করে কথা বলেছেন, সে-গানেই আবার ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও প্রশ্ন উত্থাপন করে বসেছেন এবং শাস্ত্র মেনে চলার স্বার্থকতা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর এ-রকমই একটি গান ঙ

কেউ বলে আছ তুমি কেউ বলে নাই
আমি বলি থাকলে থাকুক না থাকিলে নাই।
যারে নয়নেও দেখি নাই শ্রবণেও শুনি নাই
আছ কি না আছ মেলে না প্রমাণ॥
পাগল দ্বিজদাসের গান।
হিন্দুগণের বান্ধা আছে ত্রিসন্ধ্যা কাজ
মুসলমানের বান্ধা আছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ॥
যে জন সপ্তাহ পরেতে যায় গীর্জাতে
তাহারাই এ-জগতে মানুষ প্রধান॥
পাগল দ্বিজদাসের গান।
বেদ পুরাণ বাইবেল আদি যত ইতি পুঁথি
মানি বলেই মোদের এই দুর্গতি॥
মানতে মানতে শাস্ত্র পাই না অন্নবস্ত্র
ঘটিবাটি লাঠি বেচে কর্মে দিছি দান॥
পাগল দ্বিজদাসের গান।

প্রাচীন ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রে বলা হয়েছে - *'বাদে বাদে জায়তে তত্ত্ববোধ' অর্থাৎ বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই তত্ত্বের বোধ জন্মে।* সত্যসন্ধানের জন্য বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই এগুতে হয়, বাদ-প্রতিবাদ ছাড়া মুক্তবুদ্ধির চর্চা কোনো মতেই সম্ভব নয়। বাঙালী লোকসমাজ আবহমান কাল ধরে এই বাদ-প্রতিবাদের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে এসেছে এবং বাংলার সংগীত-সংস্কৃতিতে বাদ-প্রতিবাদ একটি প্রভাবশালী স্থান দখল করে আছে। বিচার গান, পাল্লা গান, গম্ভীরা গান, কবিগান ইত্যাদির আসর বাংগালীর লোকজীবনে আজও মুক্তবুদ্ধি চর্চার *'সজীব মঞ্চ'*। বিশেষ করে কবিগানের - গান ও কবিতার যুগ্ম-সৃষ্টি এই কবিগান শুধু কবিতা বা গানই নয়, বিতর্কও বটে। বিতর্কের জন্যই কবিগানের আরেক নাম

‘কবির লড়াই’। কবিগানের আসরে দুই কবিয়াল ধর্মশাস্ত্র থেকে শুরু করে সমাজনীতি ও রাজনীতি পর্যন্ত বহুবিধ বিষয় নিয়ে এমন খোলামেলা বিতর্কের অবতারণা করেন যে তাতে বোঝা যায় - স্থিতাবস্থার সমর্থক ও মানুষের স্বাধীন চিন্তন বিরোধী কর্তৃত্বশীল শক্তি বিধিনিষেধের নানা বেড়াজাল দিয়েও লোকসমাজের স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির প্রবাহটিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। সঙ্গীতের মতই ছড়া, পাঁচালি, ধাধা, প্রবাদ ও লোকনাট্যসহ লোক-সংস্কৃতির সকল প্রকরণেই কোনো-না-কোনোভাবে মুক্তবুদ্ধির অভিব্যক্তি ঘটে। তবে সে-অভিব্যক্তি যে খুব সহজেই ঘটতে পারে, তা অবশ্যই নয়। মুক্তবুদ্ধিকে কুসংস্কারের পঙ্কিলে ডুবিয়ে দেয়ার মত এমন অজস্র উপাদান লৌকিক ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত-মিশ্রিত হয়ে গেছে। কায়েমি স্বার্থের ধারক-বাহকরাসহজে লোকসাধারণের মুক্তবুদ্ধির অভিব্যক্তিকে মেনে নেয়নি; কখনো ধর্মশাস্ত্রীয় নেশার আফিম খাইয়ে, আবার কখনো পেশীশক্তির জোরে মুক্তবুদ্ধিকে তারা দাবিয়ে রাখতে সতত প্রচেষ্টা করেছে। ওদের সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করে, আবার কখনো জীবনের ঝুঁকি নিয়েই সকল মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তনশীল লোকধর্ম প্রবক্তা, লোককবি ও লোক-নায়ককে এগিয়ে যেতে হয়েছে।

আধুনিক বাংলায় মুক্তবুদ্ধির চর্চা

বাংগালীর জাতীয় জীবনে মুক্তবুদ্ধি চর্চার আলোচনায় বাংলা-সাহিত্যের দুই উজ্জ্বল তারকা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ও বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের (১৮৯৯- ১৯৭৬) ভুমিকা বিবেচনা একেবারে না করলেই নয়। বাংলা-সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই দুই যুগ-বিজয়ী কবির অবদান অতুলনীয়। আর তাঁদের সাহিত্য রচনায়ও মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী চিন্তা-চেতনা সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এখানে বিবেচনা আবশ্যক যে, রবিঠাকুর ও নজরুল বাউল পন্থার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাউল গানের মধ্যে রবিঠাকুর খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর প্রাণধর্মের মর্মকথা। বাউলের মানবতাবাদী জীবনচেতনা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল এবং তাঁর গানে ও কবিতায় বার বার এসেছে বাউল প্রসঙ্গ। ১৮৯০ সালে লালনের মৃত্যুর আগে ও পরে রবিঠাকুর শিলাইদহে আসা-যাওয়া করেছেন কিন্তু লালনের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা তার কোনো তথ্য নেই। কিন্তু সেখানকার লালনের শিষ্যদের সাথে তাঁর ভাল পরিচয় ছিল। তাঁদের চিন্তা-চেতনা রবিঠাকুরকে কতটা আলোড়িত করেছিল তার ধারণা পাওয়া যায় যখন তিনি কালীমোহনকে বলেন ঃ

> ‘‘তুমি তো দেখেছ শিলাইদহতে লালন শাহ ফকিরের শিষ্যগণের সহিত ঘন্টার পর ঘন্টা আমার কিরূপ আলাপ জমত। তারা গরীব। পোষাক-পরিচ্ছদ নাই। দেখলে বোঝবার উপায় নাই তারা কত মহৎ। কিন্তু কত গভীর বিষয় কত সহজভাবে তারা বলতে পারত।’’

এদিকে শিলাইদহের বাউল ডাকপিয়ন গগন হরকরা কলকাতাতে একতারা বাজিয়ে রবিঠাকুরকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন ঃ

'কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।'

এই গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে রবিঠাকুর লেখেন তাঁর বিখ্যাত গান যা বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পায় ঃ *'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভাল বাসি'*।

গগন হরকরা, কাঙাল হরিনাথ, গোঁসাই গোপাল, সর্বক্ষেপী বোষ্টমী ও লালন শিষ্যদের কণ্ঠে রবিঠাকুর বাউল গান উপভোগ যা তাঁর মাঝে এক *'বাউল রবিঠাকুর'*-এর অনুভব আনত। তিনি নিজেই সেটা স্বীকার করেন তাঁর উক্তিতে - *'বাউলের সুর ও বাণী কোনো এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।'* বস্তুবাদী বাউল তত্ত্বের অনুরাগেই তিনি সুর মিলিয়েছেন ঃ

*'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
আমি তাই হেরি তায় সকল খানে।'*

অথবা,

*'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাইনি
বাহির পানে চোখ মেলেছি
হৃদয় পানে চাইনি।'*

কিংবা,

*'আমার দোসর যে জন ওগো তারে কে জানে
একতারা তার দেয় কি সাড়া আমার গানে কে জানে।'*

'পত্রপুট' কাব্যের পঞ্চদশ কবিতাতে রবিঠাকুর বাউল চিন্তা-ধারাকে চিত্রায়িত করেছেন এভাবে ঃ

*'ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত
দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে
পূজাব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।
ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভক্তির আলোকে,
নক্ষত্র খচিত আকাশে,
পুষ্প খচিত বনস্থলীতে,
দোসর জনার মিলন বিরহের
গহন বেদনায়।'*

এমন কি বাউলের মহিমান্বিত জীবন-দর্শনে একাকার হয়েছিলেন ওদের সংগে ঃ

'কবি আমি ওদের দলে-
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।'

বাউলের ধর্মাচার-বিবর্জিত জীবন দর্শনে দোলায়িত হয়ে রবিঠাকুর প্রথাসিদ্ধ ধর্মীয় আচারের অন্তঃসারশূন্যতা সুস্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন ঃ

''আমার ধর্ম কী, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বলতে পারিনে - ***অনুশাসনের আকারে কোন পুঁথিতে লেখা ধর্ম সে তো ধর্ম নয়।''***

'পত্রপুট' কাব্যের তিনি চিত্রিত করেছেন তাঁর জীবনের শেষ উপলব্ধি। তিনি জীবনের হিসেব মেলাতে বসলেন এভাবে ঃ

'এমন করে দিন গেল;
আজ আপন মনে ভাবি,
কে আমার দেবতা
কার করেছি পূজা।
শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে,
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব বলে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখেছি প্রমাণ হয় নি আমার জীবনে।
কেননা আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।'

অন্যদিকে ***কবি নজরুলের*** উপর তো ছিল বাউলের আরো গভীর প্রভাব। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিদ্রোহী সুরে নিজেকে একজন বাউল হিসেবেই পরিচয় দিলেন ঃ

'আমি ভাই খ্যাপা বাউল
আমার দেউল আমার এই আপন দেহ।'

নজরুল তাঁর *'সাম্যবাদী'* কবিতাতে বাউলের বস্তুবাদী দেহতত্ত্ব ও মানবতাবাদী জয়গানই ধ্বনিত করেছেন ঃ

'তোমাতে রয়েছে সকল কিতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ।

তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার,
কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর পুঁথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে —
বন্ধু বলিনি ঝুট,
এই খানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয় সেই নীলাচল, কাশী, মথুরা বৃন্দাবন,
বুদ্ধগয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়
এইখানে বসে মুসা ইসা পেল সত্যের পরিচয়।
..............................মিথ্যা শুনিনি ভাই
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।'

অথবা,

'গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই
নহে কিছু মহীয়ান।'

কবি নজরুল ধর্মশাস্ত্রের অবদান মানবসমাজে কেবলমাত্র মানুষে মানুষে ঘৃণা, দাঙ্গা আর ভেদাবেদ - এসব অবলোকন করে ব্যাথাতুর ওবিদ্রোহী হয়ে উঠে মোল্লা-পুরোহিতদের হাত থেকে সকল ধর্মগ্রন্থকে ছিনিয়ে নিতে বলেছেন। শুধু তাই নয়, ঐসব ধর্মগ্রন্থ নিছক মানুষেরই সৃষ্ট বলে গেছেন অবলীলায় ঃ

'মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি,
ও মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে
*পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল! **মূর্খরা সব শোনো***
মানুষ এনেছে গ্রন্থ - গ্রন্থ আনেনি
মানুষ কোনো।'

কবি নজরুল মানব সমাজে ধর্মের অভিশাপ বা ধর্মীয় অনাচার-নিপীড়নকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করেছেন যা তাঁকে গভীরভাবে মর্মাহত করে। তাই তিনি আপোষহীন ক্ষোভে চরম বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন ধর্ম বা সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে। তিনি ***'বিদ্রোহী'*** কবিতায় নিজেকে (মানুষকে) স্রষ্টার উপরে স্থান দিয়ে জ্বালাময়ী ভাষায় বিধাতার আরশকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন এভাবে ঃ

'ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন আরশ ছেদিয়া,
*উঠিয়াছি চির-**বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!'***

অথবা,

‘আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।’

অথবা,

আমি রুষে উঠি’ যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!’

কবি নজরুল তাঁর ***‘ধুমকেতু’*** কবিতায় তো আল্লা-ভগবান-ঈশ্বরকে আরো বেশী নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন ঃ

‘কাল-বাঘিনী যেমন ধরিয়া শিকার
তখনি রক্ত শোষে না রে তার,
দৃষ্টি-সীমায় তাহারে উগ্রচণ্ড সুখে
পুচ্ছ সাপটি’ খেলা করে, আর শিকার মরে সে ধুঁকে।
তেমনি করিয়া ভগবানে আমি
দৃষ্টি-সীমায় রাখি দিবাযামী
ঘিরিয়া ঘিরিয়া খেলিতেছি খেলা, হাসি’ পিচাশের হাসি
এই অগ্নি-বাঘিনী আমি সে সর্বনাশী।’

কিংবা,

আর সাপে-ঘেরা অসহায় শিশু সম
বিধাতা তোদের কাঁপিছে, রুদ্র ঘূর্ণির মাঝে মম!
আজিও ব্যথিত সৃষ্টির বুকে ভগবান কাঁপে ত্রাসে,
স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টি পাছে বা বড় হয়ে তারে গ্রাসে!

নজরুল তো স্রষ্টাকে সবল পদাঘাতে ও বজ্রমুষ্ঠিতে ক্ষত-বিক্ষত, চূর্ণ-বিচুর্ণ করতে কিংবা আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করতে কোনো দিধাবোধ করেন নি। যেমন তিনি *‘বিদ্রোহী’* কবিতায় বলেন ঃ

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ***ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন!***
আমি স্রষ্টা-সূদন, ***শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!***

তেমনি **‘ধুমকেতু’** কবিতায় বলেন ঃ

ঐ ‘বামন বিধি’ সে আমারে ধরিতে বাড়িয়েছিল রে হাত
মম অগ্নি-দাহনে জ্বলে পুড়ে তাই ঠুঁটো সে জগন্নাথ!
আমি জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি, সৃষ্টির ঐ চাতুরী,
তাই বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে ***ঠুকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি।***

বা,

বল কি? বল কি? ফের বল ভাই ***আমি শয়তান-মিতা!***
হো হো ভগবানে আমি পোড়াব বলিয়া জ্বালিয়েছি বুকে চিতা!

অথবা,

ভগবান? সে তো হাতের শিকার - মুখে ফেনা উঠে মরে!
ভয়ে কাঁপিছে কখন পড়ি গিয়া তার আহত বুকের ’পরে।

রুদ্র কবি নজরুল ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত স্রষ্টাকে এতটাই নিছক বুঝতে পেরেছিলেন যে কোরানে বর্ণিত জাহান্নামের প্রচণ্ড শাস্তিকেও তিনি অবলীলায় অগ্রাহ্য করেছেন তার ***বিদ্রোহী*** কবিতায় ঃ

আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্ব্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!

মুক্তবুদ্ধি চর্চায় আরজ আলী মাতুববর

বাঙ্গার লোকসমাজে মুক্তবুদ্ধির চর্চার জগতে এক সনিষ্ঠ সাধক আরজ আলী মাতুব্বর। গ্রাম্য পটভুমি থেকে উঠে আসা আরজ আলীকে অনেক সংগ্রাম করে, চরাই-উৎরাই পার হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়েছে। তবে তাঁর সংগ্রামের রীতি-পদ্ধতিতে সংযোজন ঘটেছে এক অন্যতর বৈশিষ্টের। আরজ আলী মাতুব্বরকেও ক্ষমতাধরদের ধর্মবিধানের বিরোধিতা করতে হয়েছে বটে, কিন্তু লোকধর্মের প্রবক্তাদের মত ধর্ম দিয়ে ধর্মকে গায়েল করার পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেননি। ধর্মের আওতায় থেকে ধর্ম দিয়েই ধর্মের বিশেষ বিশেষ বিশ্বাস ও বিধানকে প্রতিহত করার সুবিধা যেমন আছে, তেমনি তার সীমাবদ্ধতাও অনেক। বিশেষ করে বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে সেই সীমাবদ্ধতা খুবই প্রকট হয়ে উঠেছে; আবার বিজ্ঞানই সেই সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠার জন্যে এক ধারাল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যুগ-সচেতন আরজ আলী মাতুব্বর এ-সব বিষয়ে সচেতন হয়ে বিজ্ঞানকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন ধর্মধ্বজীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। তিনি তাঁর মুক্তবুদ্ধি চর্চার চেতনা-পদ্ধতিকে চিত্রিত করেছেন এভাবে ঃ

> *‘‘জগতে এমন অনেক বিষয় আছে, যে সব বিষয়ে দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম এক ওকথা বলে না। আবার ধর্মজগতেও মতানৈক্যের অন্ত নাই। যেখানে একই কালে দুইটি মত সত্য হইতে পারে না, সেখানে শতাধিক ধর্মে প্রচলিত শতাধিক মত সত্য হইবে কিভাবে? যদি বলা হয় যে, সত্য হইবে একটি; তখন প্রশ্ন হইবে কোনটি এবং কেন? অর্থাৎ সত্যতা বিচারের মাপকাঠি (criterion of truth) কি? সত্যতা বিচারের উপায় (Test of truth) কি এবং সত্যের রূপ (Nature of truth) কি?’’*

তিনি সত্যের সন্ধান বা জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ধর্মকে বিজ্ঞান-দর্শনসহ অন্যান্য পার্থিব বিষয়ের রীতি-পদ্ধতিকে তিনি আলাদা করে ফেলেন অত্যন্ত সহজ ভাষায় ঃ

“বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে আমাদের সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান যাহা বলে, তাহা আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বিশ্বাস করি। কিন্তু অধিকাংশ ধর্ম ও ধর্মের অধিকাংশ তথ্য অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।”

এবং

“স্বভাবত মানুষ সত্যকেই কামনা করে, মিথ্যাকে নয়। তাই আবহমানকাল থেকেই ***‘সত্যের সন্ধান’*** *করিয়া আসিতেছে। দর্শন, বিজ্ঞান, ভুগোল, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি জ্ঞানানুশীলনের বিভিন্ন বিভাগ সর্বদাই চায় মিথ্যাকে পরিহার করিতে। তাই দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক, কোন ঐতিহাসিক বা নৈয়ায়িক সজ্ঞানে তাঁহাদের গ্রন্থে মিথ্যার সন্নিবেশ করেন না। বিশেষত তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থের ভূমিকায় এমন প্রতিজ্ঞাও করেন না যে, তাঁহাদের গ্রন্থের কোথাও ভুলভ্রান্তি নাই; অথবা থাকিলেও তাঁহারা সংশোধন করিবেন না। পক্ষান্তরে যদি কাঁহারো ভুলত্রুতি প্রমাণিত হয়, তবে তিনি তাহা অম্লামবদনে স্বীকার করেন .... এক যুগের বৈজ্ঞানিক সত্য আরেক যুগে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যায় এবং যখনই উহা প্রমাণিত হয়, তখনই বৈজ্ঞানিক সমাজ উহাকে জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করেন ও প্রমাণিত নূতন সত্যকে সাদরে গ্রহণ করেন।*
ধর্ম জগতে কিন্তু ঐরূপ পরিলক্ষিত হয় না। তৌরিত, জব্বুর, ইঞ্জিল, কোরআন, বেদ-পুরাণ, জেনদ-আভেস্তা ইত্যাদি .... প্রত্যেকটি গ্রন্থই বলিয়া থাকে যে, এই গ্রন্থই সত্য। যে বলিবে যে মিথ্যা - সে নিজে মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী, পাপী অর্থাৎ নারকী।
..................অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থই গ্রন্থকারবিহীন অর্থাৎ ঐশ্বরিক বা অপৌরুষেয়, সুতরাং উহা সংশোধন করিবেন কে?”

আরজ আলীর এই বিশ্লেষনের ভিত্তিতে স্বতঃস্ফূর্তই মনে বেজে উঠে - ***কোপারনিকাস, ব্রুনো ও গ্যালিলিও-র যে চরম সাহস, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মহুতির বিনিময়ে বাইবেলের ‘পৃথিবী- কেন্দ্রিক’ সৌরজগৎ তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হল, সেই ত্রুটিপূর্ণ ও মিথ্যে তত্ত্বটি বাইবেলের পাতায় এখনো নির্লজ্জের মত পেতে থাকে ও ভবিষ্যতে থাকবে***। জীবন চলায় বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ ও প্রয়োজনীয়তাকে আরজ আলী ব্যক্ত করেছেন এভাবে ঃ

“মানুষের জাতীয় জীবনের যৌবনে বিংশ শতকের এ যুগেও বিজ্ঞানীরা যখন পদার্থের পরমাণু ভেঙ্গে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছেন, মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছেন এবং প্রস্তুতি নিচ্ছেন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার জন্য, তখনো তপস্বীরা গবেষনা চালাচ্ছেন ***‘মার্গ দিয়ে বদবায়ু বেরুলে তাতে ভগবানের আরাধনা চলে কি-না’*** *- এই জাতীয় ব্যাপার নিয়ে।”*

বদ্ধমুল ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি যে নিতান্তই বিচার-বিবেচনাহীন, অন্ধ ও নড়বড়ে তা তিনি অবলীলায় বলে গেলেন ঃ

> *''ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে, জ্ঞানই পুন্য (Knowledge is virtue)। কিন্তু যে বিষয়ে কোন জ্ঞান জন্মিল না, সে বিষয়ে পুন্য কোথায়? কোন বিষয় না দেখিয়াও বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু একেবারেই না বুঝিয়া বিশ্বাস করে কিভাবে? যাজক যখন দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষনা করেন যে, না দেখিয়া, এমনকি না বুঝিয়াই ঐ সকল বিশ্বাস করিতে হইবে, তখন মানুষের বিশ্বাস না জন্মিলেও পাপের ভয়ে অথবা জাতীয়তা রক্ষার জন্যে মুখে বলা হয়, 'আচ্ছা'। বর্তমানকালের অধিকাংশ লোকেরই ধর্মে বিশ্বাস এই জাতীয়।''*

আরজ আলী মাতুব্বর বাউল-নজরুলের মতই ধর্মশাস্ত্রসমূহকে মানুষের মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টির আধার আখ্যায়িত করে মানবতাবাদ ও সাম্যের স্বপ্নকেই ধারণ করেছেন ঃ

> *''বর্তমান যুগে পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মই আস্তিক। বিশেষত একেশ্বরবাদী। হিন্দুধর্মও মূলত একেশ্বরবাদী। তাহাই যদি, অর্থাৎ জগতের সকল লোকই যদি একেশ্বরবাদী হয়, তবে তাহাদের মাঝে 'ভ্রাতৃভাব' থাকা উচিত। কিন্তু আছে কি? আছে যত হিংসা, ঘৃণা, কলহ ও বিদ্বেষ।* ***সম্প্রদায়বিশেষে ভুক্ত থাকিয়া মানুষ মানুষকে এত অধিক ঘৃণা করে যে, তদ্রূপ কোন 'ইতর প্রাণীও' করে না।*** *হিন্দুদের নিকট গোময় (গোবর) পবিত্র, অথচ অহিন্দু মাত্রেই অপবিত্র। পক্ষান্তরে মুসলমানের কাছে কবুতরের বিষ্ঠাও পাক, অথচ অমুসলমান মানূষ মাত্রেই নাপাক। পুকরে সাপ, ব্যাঙ মরিয়া পচিলেও উহার জল নষ্ট হয় না, কিন্তু বিধর্মী মানুষে ছুঁইলেও উহা অপবিত্র হয়। কেহ কেহ এমন কথাও বলেন যে, অমুসলমানী পর্ব উপলক্ষে কলা, কচু, পাঁঠা ইত্যাদি বিক্রি করাও মহাপাপ। এমনকি মুসলমানের দোকান থাকিতে কোন কিছু ক্রয় করাও পাপ।* ***এই কি মানুষের ধর্ম? না ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা?***
>
> ***মানবতার মাপকাঠিতে মানুষ একে অন্যের ভাই, ভালবাসার পাত্র, দয়া-মায়ার যোগ্য, সুখ-দুঃখের ভাগী। এক কথায় একান্তই আপন। কিন্তু ধর্মে বানাইল পর।''***

বাংলার ঐতিহ্যের মুক্তবুদ্ধি চর্চার উত্তরাধিকার বহন

আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে ***বাংলা ভাষা***'র তথা '***বাংগালী জাতির উষালগ্নে***'ই সরহপাদ প্রমুখ দোহাকোষ ও চর্যাপদ রচয়িতাগণ তৎকালীন যুক্তিহীন, ভ্রান্ত, বৈষম্য-সৃষ্টিকারী ও নিপীড়ণমূলক ব্রামন্য ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধে সমালচনায় যে মুক্তবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন সেটা মূলত আদি-ভারতীয় *চার্বাক* ও পরবর্তি *বুদ্ধীয়* বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী চিন্তাচেতনারই প্রতিফলন। বস্তুবাদী ও যুক্তিতর্কবাদী মুক্তবুদ্ধি চর্চার এই প্রাচীন স্রোত-প্রবাহটি বাংলার লোক- সমাজের চিন্তাশীল লোকনায়কগণ যুগে যুগে সক্রিয় ও চলমান রেখে গেছেন এবং সেই সাথে সেটাকে ক্রমশ সমৃদ্ধ করেছেন। লোকধর্মের বিবর্তনের এই গতিশীল ধারায় গৌতম বুদ্ধের *'বুদ্ধ মতবাদ'*-এর এক গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বস্তুবাদী *'বুদ্ধ মতবাদ'* একদিকে যখন ক্রমেই ভাববাদী শাস্ত্রীয় ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে, অন্যদিকে লোকসমাজের প্রগতিশীল ও বিবর্তনবাদী লোকেরা সে-মতবাদকে সতত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সমৃদ্ধ করণে ব্রতী হয়েছে, যার ফলস্বরূপ ক্রমানুয়ে সৃষ্ট হয়েছে বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান, নাথ পন্থা ইত্যাদি। বিবর্তিত বুদ্ধমতবাদের প্রভাবশালী ধারাটি হল *'লৌকিক বৌদ্ধ সহজিয়া'* যা ক্রমান্বয়ে *'বৈষ্ণব সহজিয়া'* হয়ে '*বাউল পন্থা*'য় রূপ নেয়। বাউল পন্থা ও তার 'শিরোমণি' লালন শাহের রচনাবলী তো বাংলার ঐতিহ্যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বৈষম্য-সৃষ্টিকারী ও ভিত্তিহীন সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় আচারের সমালোচনায় মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদ চর্চার এক অনন্য আধার। বাংলার মাটিতে প্রচণ্ড মানবতাবাদী, সাম্যবাদী ও প্রজ্ঞাশীল চিন্তনের এক আপোষহীন মহানায়ক ছিলেন লালন শাহ। কিন্তু ধর্মাচার সমালোচনামূলক ইহজাগতিক বাউল দর্শনের (তথা লালনের রচনায়) উপর মধ্যযুগের মানবতাবাদী ভাবসাধক কবীর, নানক, দাদূ প্রমুখের চিন্তা-চেতনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। লালন অপেক্ষা প্রায় পৌনে চারশত বছর আগে জন্মগ্রহণকারী ভাবসাধক কবীরের (১৩৯৮-১৫১৮) চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে লালন পরিচিত ছিলেন। লালনের দু'একটি গানেও কবীরের প্রসংগ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, লালন গেয়েছেন ঃ

ভক্ত কবীর জেতে জোলা
প্রেম ভক্তিতে মাতোয়ালা।

লালনের *'সব লোকে কয় লালন কি নাম সংসারে'* গানের মধ্যে কবীরের একটি 'বীজক'-এর সরাসরি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কবীর লিখেছেন ঃ

যদি সুন্নতই ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়
তবে ঐ অবস্থাতেই তোমার জন্ম হল না কেন?
যদি সুন্নত (খৎনা) দিলে মুসলমান হওয়া যায়,
নারীর তবে কি বিধান হবে?
....

গলায় পৈতে দিয়ে বামুন হলে,
তোমাদের স্ত্রীরা তবে কি পরবে?

ওহে পণ্ডিত! শূদ্র তোমার অন্ন ছুঁলে
কেমন করে খাও তুমি
হিন্দু বা তোমরা কোথা থেকে এলে?

[Linda Hess অনুদিত 'The Bijak of Kabir' থেকে শ্রী সনৎকুমার মিত্র কর্তৃক ভাষান্তরিত]

কবীরের এই চিন্তাসূরই লালন শাহ তুলে ধরেছেন তাঁর গানেঃ

যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারী লোকের কি হয় বিধান
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ
বামনী চিনি কিসে রে॥

কেউ মালা কেউ তসবী গলায়
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কার রে॥

কবীর যে মূলত বাউল পন্থার একজন *'প্রভাবশালী পূর্বসূরী'* ছিলেন, তার আরো প্রমাণ মিলে তাঁর বাউলের ন্যায় উপলব্ধিতে - *ধর্ম বাহিরে নয়, ধর্ম ভিতরে*। তাই তাঁর পরামর্শ ঃ

''বাহিরে যাও কোথায়? দেহ মন্দিরে তোমার
আপন ঘরেই চলিয়াছে অপরূপ লীলা
দেখিয়া ধন্য হও।''

অথবা,

''স্বামী তোমার মধ্যে, স্বামী আমার মধ্যে,
যেমন প্রাণ সকল বীজের মধ্যে। ওরে সেবক,
মনে মনে গর্ব করিস না, আপনার মধ্যে তাহাকে
অন্বেষণ করিয়া দেখ।''

কবীরের এই ধ্যান-ধারণার প্রতিধ্বনিই ধ্বনিত হয়েছে বাউল লালনের গানে ঃ

আদি মক্কা এই মানবদেহ, দেখে নারে মন-ভেয়ে।
দেশ-দেশান্তর দৌঁড়ে কেন মরছ রে হাঁফায়ে॥

অথবা,

মানুষ ভজলে মানুষ হবি।
মানুষ ছাড়লে ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি॥

জাত-ধর্মের বিভেদবিহীন বাউলের মত কবীরও জাত-পাতকে প্রত্যাখ্যান করে লিখেছেন ঃ

হিন্দু মরে রাম রাম করে।
মুসলমান মরে খোদা খোদা করে
কবীর বলছেন এই সব ভেদবুদ্ধির মধ্যে
যে না পড়ল সেই বাঁচল।

কবীরের এই চেতনাকেই লালন শাহ আরো বিক্ষুব্ধ ভাষায় প্রতিধ্বনিত করেছেন এভাবে ঃ

লালন বলে হাতে পেলে
জাত পোড়াতাম আগুন দিয়ে

এই চেতনাই লালন সমকালীন বাউল গীতিকার পাঞ্জুশাহ (১৮৫১-১৯১৪) তার গানেও উচ্চারণ করেন এভাবেঃ

জাতের বড়াই কি
ইহকাল পরকালে জাতে কি করে –
আমার মন বলে অগ্নি জ্বেলে দি
জাতের মুখি॥

এটা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় যে, বাংলার ঐতিহ্য-ভাণ্ডারে মুক্তবুদ্ধি চর্চার এক অতুলনীয় আধার বাউল পন্থা মূলত পূর্বসূরী ভাবসাধক কবীর ও অন্যান্য লোকনায়কদের চিন্তা-চেতনারই প্রতিধ্বনি। অবশ্যই বাউল চিন্তাবিদগণ সে-চিন্তাধারাকে ব্যাপক সমৃদ্ধ করেছে। আর বাউল চিন্তাধারা দ্বারাই আবার প্রভাবিত হয়েছিলেন কবি নজরুল ও রবিঠাকুর। নজরুল-রবীন্দ্রনাথ যদিও বস্তুবাদী ও মানবতাবাদী বাউলীয় মুক্তবুদ্ধি চর্চার গতি-প্রবাহকে প্রভুত সমৃদ্ধ করেছেন, তবে তাঁদের রচনাবলী আর বাউল রচনাবলীতে এক সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নজরুল- রবিঠাকুরের রচনাসমুহে রয়েছে এক সুস্পষ্ট আত্ম-বিতর্কের ছাপ, অর্থাৎ তাঁদের রচনায় ইহজাগতিক বস্তুবাদ, মানবতাবাদ ইত্যাদি যেমন অলঙ্কৃত ও মহিমান্বিত হয়েছে, তেমনি ভাববাদ ও শাস্ত্রধর্মবাদও বিশেষ অবস্থান দখল করেছে। বিশ্বকবি রবিঠাকুর যে *‘গীতাঞ্জলী’* রচনা করে নোবেল পুরস্কার ও বিশ্বকবি খেতাবে ভূষিত হন,সে-গীতাঞ্জলীতে তো এক অদৃশ্য মহাশক্তি অবাধ বিরাজমান। অন্যদিকে, রুদ্রকবি নজরুল তাঁর *‘বিদ্রোহী’*, *‘ধুমকেতু’* ইত্যাদি কবিতায় ইহজাগতিক বস্তুবাদের এক অদম্য বিপ্লোবী সেনানায়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন এবং অন্যত্র সাম্যবাদী মানবতাবাদের জয়গানে মুখর হয়েছেন; তেমনি *‘কামাল পাশা’*, *‘আনোয়ার’*, *‘কোরবানী’* ইত্যাদি কবিতা রচনার মাধ্যমে নিজেকে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী ও সাম্প্রদায়িক ইসলাম ধর্মের এক আদর্শ পূজারী

বানিয়েছেন। অথচ বাউল লোকনায়কগণ আগা-গোড়া থেকে গেছেন বিশুদ্ধ ইহজাগতিক এবং সাম্য ও মানবতাবাদী। সাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যমূলক ধর্মাচারের সাথে কোনো আপোষ নেই তাঁদের, নেই কোনো বিতর্ক তাঁদের কথায় ও কাজে, রচনায় ও গানে।

বাংগালী লোকসমাজের মুক্তবুদ্ধি চর্চার আর এক মহাসাধক *'আরজ আলী মাতুব্বর'*কে বলা যায় লালন শাহ ও বাউল তত্ত্বের এক যথার্থ অনুগামী। নজরুল ও রবিঠাকুর সমকালীন আরজ আলী (১৯০০-১৮৮৫) ছিলেন বস্তুবাদ, সাম্য ও মানবতাবাদের এক একনিষ্ঠ ও নির্ভীক সৈনিক - ঠিক বাউল পন্থার অনুকরনে। আর বলা যেতে পারে, লোকসমাজের এই মানুষটি বাংলার মুক্তবুদ্ধিচর্চার বাউলীয় ঐতিহ্যকে সর্বপ্রথম আধুনিক বিজ্ঞান চেতনার উপাদান দিয়ে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এগিয়ে চলার জন্য ঐতিহ্যের শক্তভূমিতে জনগণকে দাঁড়াতেই হয়; কিন্তু কেবলমাত্র ঐতিহ্যের অনুসরণে মুক্তি নেই; বরঞ্চ ঐতিহ্যের নবায়ন, পূনর্গঠন ও সম্প্রসারণের মধ্য দিয়েই ঘটে সমাজ-প্রগতি। সেই প্রগতির মন্ত্রে নিজে উদ্বুদ্ধ হয়েই শান্ত থাকেন নি, অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সমুহ প্রচেষ্টা করেছেন মুক্তবুদ্ধির একনিষ্ঠ সাধক আরজ আলী মাতুব্বর। প্রতিকূল শক্তির সংগে সংগ্রামে সারা জীবন তিনি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও বিজ্ঞানচেতনাকে পরিত্যাগ করেন নি।

বিজ্ঞানমনস্কতা আধুনিকতা ও অগ্রগতির ধারক ও চালিকাশক্তি হলেও বর্তমান নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক মুক্তবুদ্ধিচর্চাকারীর সঙ্গে আরজ আলী মাতুব্বরের পার্থক্যটি সুস্পষ্ট। গ্রামীন মেহনতি মানুষ আরজ আলীর মুক্তবুদ্ধিচর্চা নাগরিক মধ্যবিত্তদের মত মানসিক ব্যয়াম মাত্র ছিল না। বুদ্ধিবিলাসের আত্ম-সন্তুষ্টিতে মগ্ন হয়ে থাকার মানসিকতাকে কখনো তিনি প্রশ্রয় দেন নি। সামাজিক দায়িত্ববোধই তাঁকে মুক্তবুদ্ধি চর্চায় প্রবৃত্ত করেছে। মেহনতের সূত্রে লোকসাধারণের সাথে একান্ত প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলেন বলেই লোকসমাজের সমস্যা ও সংকটের স্বরূপ তাঁর কাছে একেবারে স্ফটিকস্বচ্ছ (**Crystal-clear**) হয়ে ধরা পড়েছিল।

লালন-নজরুল-আরজ আলী প্রমুখ লোকনায়কদের মুক্তবুদ্ধিচর্চার উত্তরাধিকার বহনের পবিত্র দায়িত্ব এসে পড়েছে আমাদের চলমান প্রজন্মের কাছে। আধুনা-প্রয়াত আহমদ শরীফ, *হুমায়ুন আজাদ,* প্রবীর ঘোষ প্রমুখ চিন্তাবিদ ও লেখকগণ সেই উত্তরাধিকার বহন করার প্রয়াস করে গেছেন বা যাচ্ছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, যখন মুক্তচিন্তাচর্চার উত্তরাধিকার বহনের দায়িত্ব গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই আলোচনা হচ্ছে ঠিক তখনই সেই উত্তরাধিকারের একনিষ্ঠ বাহক *'হুমায়ুন আজাদ'* প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় ঘাতকদের হাতে মারাত্মকভাবে জখম হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। আজকের এই মর্মান্তিক ঘটনা লালন-নজরুল-আরজ আলীর সুন্দর, সাম্য ও মানবতায় ভরপুর এক মুক্তরাজ্য গড়ার জীবন-প্রয়াসকে

ব্যথিত করতে বাধ্য। কাজেই, আমাদের প্রজন্মকে দৃঢ় মনোবল, নিষ্ঠা ও ত্যাগ-তিতীক্ষা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে সে-উত্তরাধিকার বহনের প্রত্যয় নিয়ে।

– যতিন সরকার, মুক্তবুদ্ধিচর্চা ও বাঙালির লৌকিক এতিহ্য। আরজ আলী মাতুব্বর স্মারক বক্তর্তা, ১৪০৭ (২০০০)।

– মফিজুর রহমার রুননু, *যুক্তিবাদ* - চতনামুক্তির লড়াই। বাংলাদেশ যুক্তিবাদী সমিতি (২০০১)।

– কাজী নজরুল ইসলাম, অগ্নিবীণা। মাওলা ব্রাদার্স।

– আরজ আলী মাতুব্বর, আরজ আলী রচনা সমগ-১। পাঠক সমাবেশ, (২০০০)।

– আহমদ ছফা, বাংগালী মুসলমানের মন।